আশাপূর্ণা দেবী

গজ উকিলের হত্যা-রহস্য

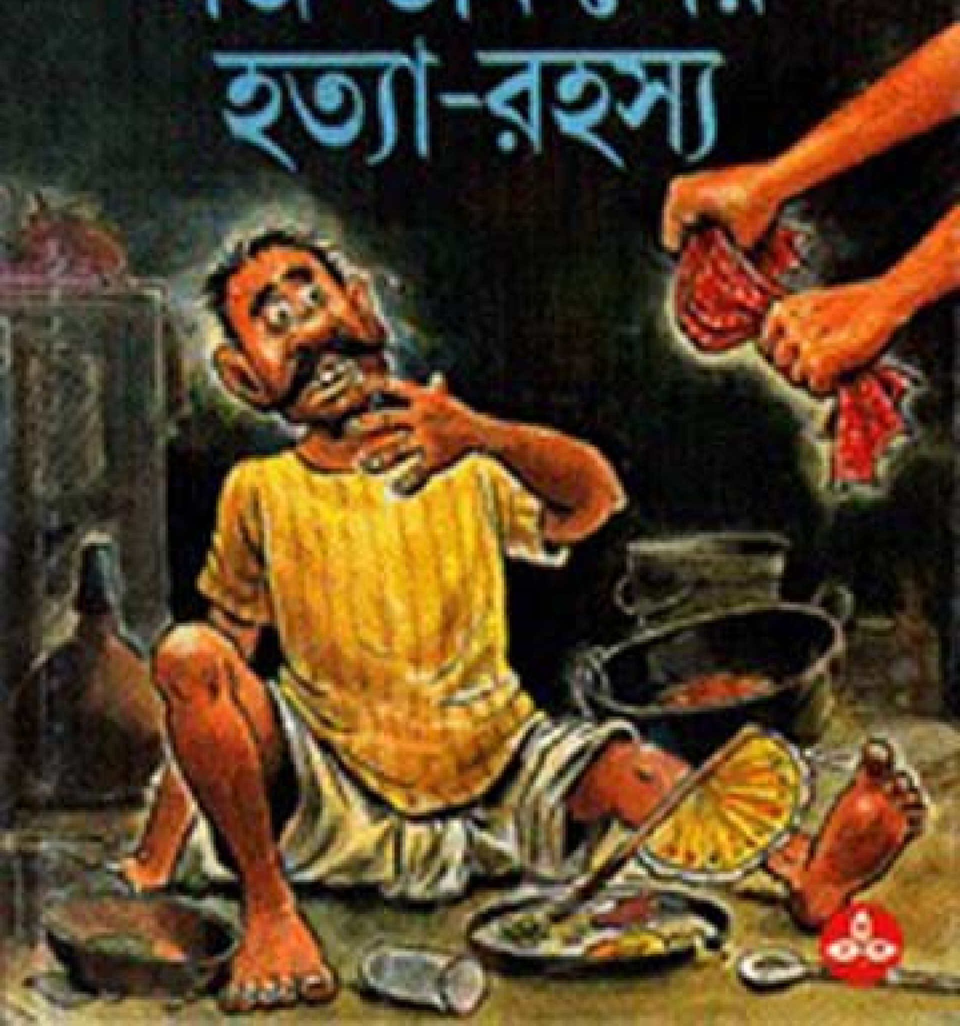

কথায় বলে, হাসতে হাসতে খুন। আশাপূর্ণা দেবীর এই নতুন কিশোর উপন্যাসে হাসতে হাসতে খুনের কিনারা। খুন, পুলিশী জেরা, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, কৌতূহল, অনুসরণ, উদ্বেগ, রোমাঞ্চ—রহস্য-উপন্যাসের সব উপকরণই এই লেখাতে রয়েছে। আর-একটি বাড়তি উপাদান রয়েছে, সচরাচর রহস্য-উপন্যাসে যা দুর্লভ, তা হল অদ্ভুত দারুণ মজাদার সব পরিস্থিতির রসাল বর্ণনা। এই উপন্যাস তাই একাধারে রসঘন এবং রহস্য-ঘন, কৌতুকময় এবং কৌতূহলকর, উত্তেজনামুখর এবং উল্লাসমণ্ডিত।

দুই বন্ধু। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকেন, দাবা খেলে সময় কাটান। গজপতি উকিল আর গুপি মোক্তার। হঠাৎ গুপি মোক্তার শুনলেন, গজ উকিল খুন হয়েছেন। গলায় গামছা পেঁচিয়ে খুন করা হয়েছে তাঁকে। অবাক কাণ্ড, সেই মুহূর্তে নিজের গামছাখানা খুঁজে পেলেন না গুপি মোক্তার। পুলিশী জেরা আর ভূতের ভয় তো ছিলই, গামছা হারানোর আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লেন গুপি মোক্তার। নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন নিজের ফ্ল্যাট থেকে। এ-দিকে দুই মূর্তিমান গুপি মোক্তারকে গোপনে অনুসরণ করে চলেছে। গুপি মোক্তারের অন্তর্ধান এবং এই দুই মূর্তিমানের পিছু-ধাওয়া—সব মিলিয়ে এক দারুণ সরস পরিণতিতে শেষ হয়েছে 'গজ উকিলের হত্যা-রহস্য'।

81-7066-728-3

গজ উকিলের হত্যা-রহস্য

আশাপূর্ণা দেবী

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ চতুর্থ মুদ্রণ মে ১৯৮৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ মদন সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৪·০০

১

হুম করে একেবারে পাশের ফ্ল্যাটে এক ভয়াবহ খুন হয়ে যাওয়ায় গুপি মোক্তার যেন বেভ্যাল হয়ে গেলেন। হবারই কথা, ব্যাপারটা শুধু ভয়াবহই নয়, রোমহর্ষকও।

গজপতি উকিলের লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারাখানি পাড়ার মধ্যে একটি প্রসঙ্গ ছিল, সেই তাগড়াই লোকটাকে কিনা দিনে-দুপুরে শুধু গলায় একখানা গামছা বেঁধে, যাকে বলে 'নিহত' করে রেখে, কে বা কারা কে জানে তাঁর লোহার আলমারির লকার খুলে যথাসর্বস্ব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, কেউ টের পেল না!

একেবারে পাশের ফ্ল্যাটের গুপি মোক্তারও না। ভাবা যায়?

তবু সেটাই শেষ কথা নয়।

বেভ্যাল হবার আরও কারণ আছে। ঘটনাটা যখন ঘটে, ঠিক তার ঘণ্টা দুই আগে গুপি মোক্তার নিজের ফ্ল্যাট থেকে ও ফ্ল্যাটে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাবা খেলে এসেছেন।

আরও খেলতেন হয়তো, গজপতি তো ছাড়তেই চাইছিলেন না, 'আর একটা দান হয়ে যাক না'—বলে ফের বোড়ে ঘোড়া নৌকো

মন্ত্রী নিয়ে সাজাতে বসছিলেন। কিন্তু এদিক থেকে গেন্নুপিসির ঘন ঘন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বাধ্য হয়ে উঠে আসতে হয়েছে গুপিবাবুকে।

গেন্নুপিসি ছাড়া ত্রিভুবনে আর তো কেউ নেই গুপি মোক্তারের, তাই তাঁর শাসনেই চলতে হয় বেচারাকে, তাঁর হেফাজতেই থাকতে হয়। কাজেই গজপতি উকিলের মতো সকাল থেকে দুপুর, আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল অবধি দাবা খেলা গুপি মোক্তারের চলে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই প্রথমে চলে আসে চাকর মলয়কুসুম; গভীর গম্ভীর গলায় বলে, "বাবু, ঠাকুমা তপ্ত হয়েছেন।"

মলয়কুসুমকে শুধু মলয় বলে ডাকলে সে বড়ই দুঃখিত হয়, পুরো নামটি বলে ডাকলেই ভাল হয়। তবে সব সময় কে আবার অত বড় নামটা ধরে ডাকে? ডাকা হয় না। তবে মলয়কুসুম যখন ঠাকুমার হয়ে ডাক পাড়তে আসে, তখন গুপি মোক্তার খুব আদরের গলায় বলেন, "যাচ্ছি বাবা মলয়কুসুম, তুই পিসিকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা করগে যা। বেশী তপ্ত হয়ে উঠলে ওনারই ক্ষতি। মাথা গরমের ব্যামো তো!"

কিন্তু মলয়কুসুম গোঁ ছাড়ে না, ঘাড় গোঁজ করে বলে, "আপনার পিসিকে ঠাণ্ডা করা স্বয়ং ভগবানেরও কম্মো নয় বাবু, ওসব ঘুঁটি-টুটি রাখুন, চলে আসুন।"

গুপি মোক্তারের চাকরের ভ্যাজভ্যাজানিতে গজপতি উকিল দারুণ চটে যান, বলেন, "তুমি কেটে পড় তো হে বাপু, মেলা বকবক কোর না।"

মলয়কুসুম হাত উল্টে বলে, "ঠিক আছে। আমি আর বকবক করছি না, এবার ঠাকুমা নিজেই এসে যাক 'হাঁস হাঁস' করতে

করতে। তখন কিন্তু আপনাদের উভয়কেই হাঁসফাঁস করতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।"

মলয়কুসুম খটখটিয়ে চলে যায়, তার একটু পরেই গেন্নুপিসির চড়া গলার ডাক দেয়াল ফুঁড়ে এপারে আসে, "গুপে, আজ খাওয়া-দাওয়া হবে? নাকি হরিমটর করে থাকতে হবে?"

গজপতি এ-শব্দ প্রায়ই শুনতে পান, তবু শুনলেই চমকে ওঠেন। চমকে উঠে বলেন, "হরিমটর মানে কী গুপিবাবু?"

গুপি সংক্ষেপে বলেন, "উপোস।"

"তা উনি, মানে পিসিমা খেয়ে নিলে পারেন—"

গুপি হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেন, "তা হলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না। খেয়েও নেবেন না, আমাকেও বকাবকি করতে ছাড়বেন না!"

গজপতিবাবু গুম হয়ে বলেন, "তা এসব তো ছেলেবেলাতেই হয়, আমি যখন ছোট ছিলাম আমার ঠাকুমা আমায় একদিনের তরে প্রাণভরে খেলতে দেয়নি। কেবলই চান করে নে, ভাত খেয়ে নে, ঘুমোবি আয়, রোদে ঘুরিসনি, জলে ভিজিসনি—এই সব নানান উৎপাত করেছে। কিন্তু এই বয়েসে?"

গুপি মোক্তার কাতর হয়ে বলেন, "আর বলবেন না। বয়েসটা যে আমার পঞ্চাশের দিকে দৌড়চ্ছে, সে কথা পিসি মানলে তো?"

এইসব কথার মধ্যেই দু-একটা বোড়ের চাল হয়ে যায়, হয়তো

বা ঘোড়ার ঝুঁটি চেপে ধরাও হয়। আর সেই রকম মোক্ষম সময় গেন্নুপিসি তাঁর ফর্সা ধবধবে মোটাসোটা শরীরটি নিয়ে সত্যিই প্রায় হাঁস-হাঁস করতে করতে এসে গম্ভীর গলায় বলেন, "গুপে, না খাস তো জবাব দে। ডেকে ডেকে গলা ব্যথা করি, এতো সস্তা গলা নয় আমার।"

তারপর আর কারও বসে থাকবার সাহস হয়? আর যার হোক গুপি মোক্তারের হয় না। সুড়সুড় করে চলেই যেতে হয় পিসির সঙ্গে। ত্রিভুবনে ওই মাসতুতো পিসিটা ভিন্ন আর কেউ নেই যখন, তখন এছাড়া আর কী করবার আছে?

গজপতি ব্যাজার মুখে ওই পিসি-ভাইপোর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেন, "ধুত্তোর! কাল থেকে একা একাই খেলব। সঙ্গী-ফঙ্গিতে দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ হয়তো বা খেলেনও একা-একা, নিজেই দু'পক্ষ হয়ে। তারপর উঠে চান করতে ও খেতে যান। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে ডাক দেন, "ও গুপিবাবু, আসবেন

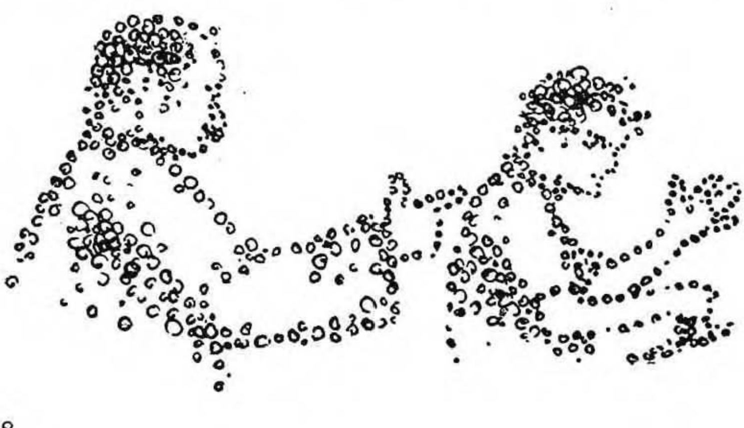

নাকি? হয়ে যাক এক দান।"

নয়তো মলয়কুসুমকে বাজার করতে যেতে বা বাজার করে ফিরতে দেখলেও ডাক দেন, "ওহে মস্তান, তোমার বাবু কোথায়? একবার ডেকে দাও না।"

মলয়কুসুম ওই 'মস্তান' কথাটা আদৌ পছন্দ করে না। বলতে কী, সহ্যই করতে পারে না, তাই ওকথা শুনলে হাঁড়িমুখ করে বলে, 'একবার ডেকে দাও' কেন, বলুন না বাবু 'আজকের মতো ডেকে দাও।' বাচ্চাদের মতো কী যে এক ঘুঁটিখেলা আপনাদের!"

বলে চলে যায়, তবে ডেকেও দেয়।

ডেকে দেয়, সেটা গেন্নুপিসির ওপর আক্রোশ করে। তিনি ভুলেও কোনোদিন মলয়কুসুমের পুরো নামটা ধরে ডাকেন না; আর উঠতে-বসতে বকেন। বেচারী যদি কোনোদিন বলে, " 'মলা মলা' করেন ক্যানো ঠাকুমা, আমার নামটা কি এতোই শক্ত যে উচ্চারণ করতে পারেন না? দাঁত তো আপনার নেইও যে, দাঁত ভাঙবার ভয়?" পিসি অগ্রাহ্যের হুমকি দিয়ে বলেন, "দাঁত ভেঙে যাবার ভয়ে তোর নাম ডাকি না? মুখপোড়ার কথা তো কম নয়? জানিস আমার শ্বশুরবাড়িতে চাকর ছিল অক্রুরনন্দন, তাকে সবসময় পুরো নামে ডেকেছি।"

"তবে? তবে আমার বেলায় 'মলা' কেন শুনি?"

গেন্নুপিসি গড়গড়িয়ে বলেন, "সে আমার খুশি! বাবুর নাম গুপি, আর চাকরের নাম মলয়কুসুম। ওরে আমার কে রে!

কক্ষনো বলব না। মলা বলব, ময়লা বলব, ব্যস।"

এই রাগেই মলয়কুসুম গুপিবাবুকে খেলতে যেতে ডেকে দেয়। দেরি হোক, ভুগুক বুড়ি।

কোর্ট যখন বন্ধ থাকে, তখনই তো যত খেলার ধুম। উকিল মোক্তার দুজনেই তখন বেকার। এখন কী জন্যে যেন ক'দিন কোর্ট-কাছারি বন্ধ যাচ্ছে, তাই খেলার ধুম বেড়েছে। সকালে খেলা সন্ধেয় খেলা।

কিন্তু এসব না-হয় গুপিবাবুর দিকের কথা। কিন্তু গজপতিবাবুরও কি ত্রিসংসারে আর কেউ নেই?

না না, তা নয়। গজপতিবাবুর সব আছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, আরও কারা সব। তবে তারা গজপতি উকিলের কাছে তো দূরের কথা, কাছাকাছিও থাকে না। মানে—গজপতি রাখেন না। তিনি বলেন, "ওই সব বৌ ছেলে মেয়ে জামাই, এরা হচ্ছে টাকা-পয়সা খরচা করিয়ে দেবার রাজা, বুঝলেন গুপিবাবু? কাছে রাখলে আর রক্ষে ছিল! একটা পয়সা জমত না। দূরে আছে, তাই যা হোক দু'চার পয়সা রাখতে পারছি। ওরা দেশের বাড়িতে আছে।"

গুপি মোক্তার জানেন, দু'চার পয়সা মানে হচ্ছে, দু-দশ হাজার টাকা। লক্ষও হতে পারে। বহুত টাকা জমিয়েছেন গজপতি। ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে রাখেন না, পাছে বৌ-ছেলে টের পেয়ে যায়। সব এই ফ্ল্যাটের মধ্যেই কোথায় না কোথায় গুজে লুকিয়ে রাখেন, তাই প্রাণ গেলেও সহজে এই ফ্ল্যাটটি ছেড়ে নড়েন না। নেহাত কোর্টে-টোর্টে বেরোতে হলে দরজায় আংটা বসিয়ে আটটা-আটটা ষোলটা তালা লাগিয়ে যান।

হঠাৎ হু হু করে যেন গলার মধ্যে কান্না উঠে এল গুপি মোক্তারের, আর কখনো তালা লাগাবে না গজপতি উকিল। লোকটাকে যে এত ভালবাসতেন তা' জানতেন না গুপি মোক্তার।

ঘটনাটা টের পেলেন গুপি মোক্তার বিকেল বেলা।

পিসির তাড়নায় নেয়ে-খেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ কিসের যেন গোলমালে ঘুমটা ভেঙে গেল। কী সেই গোলমাল? খুব কাছেই যেন। মনে হচ্ছে কারা সব আসছে যাচ্ছে, কী সব বলাবলি করছে।

'মলয় মলয়' বলে হাঁক পাড়লেন, সাড়া পেলেন না। মনে পড়ল, মলয় তো কোনো দিনই দুপুরে বিকেলে বাড়ি থাকে না। ভাত খেয়ে উঠেই বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই সন্ধ্যায়।

স্থির হয়ে কান পাতলেন, মনে হল শব্দটা যেন পাশের ফ্ল্যাটের দিক থেকে আসছে। গজপতি উকিলের বাড়ির লোকেরা, মানে ছেলেমেয়ে গিন্নি-টিন্নি হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে চলে এসেছে বুঝি। তারাই সব আসছে-যাচ্ছে।

কিন্তু তাই কি? ভারী-ভারী বুটের শব্দ যেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন, "পিসি! পিসি।"

পিসিরও নো সাড়া।

হঠাৎ ভয়ে বুকটা গুরু-গুরু করে এল গুপি মোক্তারের। পা দুটো কেঁপে গেল। আবার বসে পড়ে ডাকলেন, "এক গেলাশ জল।"

না, জলের গেলাশকে ভেবে ডাকেননি, তবে বারবার ওই রকম ডাকতেই তো চলে আসে সে, হয় পিসির হাতে, নয় চাকরের হাতে। আজ কিন্তু এল না।

ওদিকে পাশের ফ্ল্যাট থেকে অনেক রকম গলার আওয়াজ আসছে। তার সঙ্গে ভারী-ভারী জুতো-পরা পায়ের আওয়াজ। আর ক্রমশ বিকেল গাড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসছে।

গুপি মোক্তার কাঁপা-কাঁপা বুক নিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে। নিশ্চয় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই সময়টুকুর মধ্যে। কিন্তু কী হতে পারে? পিসি হারিয়ে গেছে? মলয় তাঁকে খুজতে গেছে? পাড়ার লোকে এসে জটলা করছে?

কিন্তু তাই কি সম্ভব?

বরং গোটা কলকাতা শহরটাই হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পিসি? পিসি হারাবার পাত্রী নয়।

তবে কি মলয়? আবার মনে পড়ে গেল, কিন্তু সে তো রোজই দুপুরে হারিয়ে যায়, সন্ধ্যা পার না করে ফেরে না। তাহলে?

তবে কি কোথাও চুরি-টুরি?

গজপতির বাড়িতে নয় তো? উঁহু! গজপতি তো তাহলে এতক্ষণে বুক চাপড়ে মাথা চাপড়ে পাড়া মাথায় করে তুলতেন। একবার পকেটমার হয়ে তিন টাকা তিরিশ পয়সা হারিয়ে যাওয়ায়, পাড়ার লোককে বোধহয় মাস তিনেক ধরে তিষ্ঠোতে দেয়নি সেই দুঃখের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে।

এখন তো কই ওর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। তাহলে ওর কিছু নয়।

তবে কী? কী? কী?

হায়! অবোধ গুপি মোক্তার কি তখন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছেন গজপতি উকিলের গলার আওয়াজ গামছা-মোড়া দিয়ে চিরকালের মত বন্ধ করে দিয়ে গেছে দুর্বৃত্ত পাপিষ্ঠ খুনে গুণ্ডারা ?

ওদিকে বুটের আওয়াজ সিঁড়িতে নামছে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন লাঠিও ঠোকা হচ্ছে কোথাও।

এই শীতের অবেলায় গলগলিয়ে ঘেমে উঠলেন গুপি মোক্তার আর হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিসি, মলয়, তোমরা সব্বাই মরে গেছ নাকি ?"

এই চেঁচানিতে কাজ হল।

কোন দরজা দিয়ে যেন চলে এসে পিসি বলে উঠলেন, "বালাই

ষাট, সব্বাই মরবে কেন ? মরেছে শুধু গজ উকিল। আহা, কিপ্টে হতভাগার সর্বস্ব নিয়ে গেছে গো ! না-খেয়ে না-পরে পয়সা জমিয়ে মরে ছিল হতভাগা !"

তবে তাই।

গুপি মোক্তার থতমত খেয়ে বলেন, "তা গজপতির চেঁচামেচি

শুনছি না যে?"

গেন্নুপিসি কপালে হাত থাবড়ে বলেন, 'আ আমার কপাল! তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল গুপে? মরে গেলে কেউ চেঁচাতে পারে? বললাম না, মরে গেছে গজ উকিল। খুনেরা এই দিন-দুপুরে চড়াও হয়ে বেচারাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে খতম করে ফেলে সব নিয়ে গেছে। চোখ দুটো নাকি ঠিকরে উঠেছে। তাই বলি, গুলি নয়, বন্দুক নয়, ছোরা নয়, ছুরি নয়, শুধু একখানা গামছা দিয়ে মানুষ খুন! তবে আর মানুষ সাবধান হবে কিসে বল্? গামছা তোয়ালে আবার কোন ঘরে না থাকে? কে জানত সে-সবও একটা অস্তর!"

গেন্নুপিসি আরও কত কী বলে চলেন।

কারণ কথা শুরু করলে তো সহজে শেষ করেন না তিনি। কিন্তু গুপি মোক্তারের কানে ওই 'গামছা' কথাটা ছাড়া আর কোনো কথাই ঢোকেনি। কান ভোঁ-ভোঁ করছিল তাঁর! মনশ্চক্ষে শুধু নিজের গামছাখানি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। লাল টুকটুকে রং বারান্দার তারে মেলা আছে। তার মানে লাল টুকটুকে নিরীহ চেহারা নিয়ে একটি ভয়াবহ 'নিধন অস্ত্র' ঝুলে পড়ে আছে গুপি মোক্তারের ধারেকাছে।

নাঃ, ঐ ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে আর বাড়িতে রাখা ঠিক নয়, এই দণ্ডে পুঁটুলি পাকিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তবে আর কাজ!

গুপি মোক্তার উঠলেন।

ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "পিসি, এক গেলাস জল।"

গেন্নুপিসি বললেন, "শুধু জল খাবি! সেই কখন দুটো ভাত খেয়েছিস! দাঁড়া, দু'টো আনন্দনাড়ু নিয়ে আসি, সকালে ভেজেছিলাম!"

আনন্দনাড়ু!

শুনে গুপি মোক্তারের মাথার ইলেকট্রিক তার জ্বলে ওঠে। গজপতি উকিল মরে গেল, আর আমি এখন আনন্দনাড়ু খেতে বসব?

গেন্নুপিসি উদাস গলায় বলেন, "তা তুই তো আর মারিস নি! এ দুনিয়ায় কে কার? ভগবান যখন যাকে নেন। তবে হ্যাঁ, খেলাধুলোর সঙ্গী ছিল তোর লোকটা। তা কী করবি বল? আয়, হাতটা মুখটা ধুয়ে নে!"

কিন্তু গুপি মোক্তারের মাথায় এসব কথা ঢুকছে না, তিনি যেই ভাবছেন—শুধু একখানা গামছার জোরে গজপতির মতো ওই তাগড়াই লোকটাকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে, অমনি মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠছে, আর ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, উপরে, নিচে শুধু রাশি-রাশি গামছা ঝুলতে দেখছেন। লাল টুকটুকে, তারে মেলা।

নাঃ, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা চলবে না। লোকে সন্দেহ করবে। ছাতে নিয়ে গিয়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিলে হয়। কিন্তু তাতেই কি সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে?

গুপি মোক্তারের মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলতে থাকে। আশ-পাশের লোক এখন সজাগ, হঠাৎ যদি আগুন জ্বলার দৃশ্য দেখে, ক ন্যাকড়া পোড়ার গন্ধ পায়, নির্ঘাত ছুটে আসবে।

নাঃ, এখানে নয়, দূরে চলে গিয়ে কোথাও—গঙ্গায় ? গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াই ঠিক। গঙ্গায় অমন কত গামছা ভাসে। নাইতে গিয়ে গামছা হারিয়ে আসা তো লোকের ডাল-ভাত।

আর কোনো চিন্তা নয়, একটি পুরনো খবরের কাগজে মুড়ে গামছাটিকে স্রেফ গঙ্গায়! আচ্ছা, কোন গঙ্গায় ? পাড়ার গিন্নিদের গঙ্গার ঘাটে ? উঁহু নো নো ! সেও কোন সূত্রে ফিরে আসতে পারে। হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে বড় গঙ্গায় দেওয়াই ভাল।

অতঃপর গুপি মোক্তার ভবিষ্যতে জীবনে আর কখনো গামছা ব্যবহার করবেন না ঠিক করে ফেলেন। এত বড় একটা মারণাস্ত্রকে কাঁধে পিঠে বয়ে লালন পালন করবার কোনো মানে হয় না। পিসি আনন্দনাড়ু আনতে গেছে, এই অবসরে গুপি মোক্তার পিসির ভাঁড়ার থেকে একখানা পুরনো খবরের কাগজ হাতিয়ে নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যান।

কিন্তু এ কী ?

কোথায় সেই লাল টুকটুকে মোলায়েম গামছাখানি ? তারে যাকে ঝুলে থাকতে দেখতে পাবার কথা ! নাঃ নেই। সামনে পিছনে, ধারেকাছে কোথাও নেই। তাহলে ? গেল কোথায় ?

তবে কি—

হঠাৎ আচমকা একটা সন্দেহে গুপি মোক্তারের হৃৎপিণ্ডটা দুম দুম করে দুলে ওঠে। দুর্বৃত্তরা আগে গুপি মোক্তারের বাড়িতেই

এসে ঢোকেনি তো? তারপর হাতাবার মতো কিছু না পেয়ে ওই গামছাখানা নিয়েই সটকেছে? নিশ্চয়ই তাই। ওইটা নিয়ে গিয়ে হানা দিয়েছে গজপতি উকিলের বাড়ি। হয়তো বাসন-কোসন জিনিসপত্র গামছাটায় বেঁধে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল, তারপর শূন্য বাড়িতে একা গজপতিকে দেখে ভয়ঙ্কর হিংস্র ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে তাদের।

হ্যাঁ, একেবারে একা বাড়ি। একটা চাকরও রাখেন না গজপতি, নিজের সব কাজ নিজে করে নেন। মানে 'রাখতেন না', 'নিতেন'। এখন তো গজপতিবাবু 'ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের' প্রথমটি হয়ে বসে আছেন। এখন তাঁর ব্যাপারে সবই 'তেন' দিয়ে বলতে হবে।

গুপি মোক্তার আর-এক দুর্ভাবনায় পড়লেন। এরপর পুলিসী তদন্তে যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে গামছাটা গুপি মোক্তারের, আর হত্যাকাণ্ডের মাত্র দু' ঘণ্টা আগেও গুপি মোক্তার নিহতের বাড়িতেই ছিলেন, তাহলে?

গুপি মোক্তার আর ভাবতে পারেন না।

শুধু এইটুকু ভাবেন, এখানে আর এক দণ্ডও তিষ্ঠোনো নয়। চোঁ চাঁ পালাতে হবে। হ্যাঁ, পালাতেই হবে। শুধু পুলিসের সন্দেহের ভয়েই নয়, ওই ভয়ানক কাণ্ডটাও কারণ! জলজ্যান্ত একটা লোক সত্যি সত্যি খুন হয়ে গেছে! কিছুক্ষণ আগেও যার সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন গুপি মোক্তার!

বাড়ি থেকে বেরোতে-আসতে ওই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটার সামনেটি দিয়ে ছাড়া তো গতি নেই। কোনো কোনোদিন বেড়িয়ে ফিরতে কত রাত্তিরও তো হয়ে যায়। ওরে বাবা!

সর্বনাশ। অসম্ভব। কে বলতে পারে ভূত হয়ে যাওয়া গজপতি

খোনা গলায় ডেকে উঠবেন কিনা, এই যে গুপি আসবে নাকি? এক দাঁন হয়ে যাঁক না!

গুপি মোক্তার চারিদিক তাকালেন। দেখলেন, দেয়ালের পেরেকে বাজারের থলিটা ঝুলছে। ফ্যাস করে টেনে নিলেন সেটা। তাড়াতাড়ি তার মধ্যে কিছু টাকা, একখানা ধুতি, একটা লুঙ্গি, একটা জামা, আর টুথব্রাশটা ভরে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে তার পিছনের দরজাটা খুলে, জমাদার ওঠবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বুকের মধ্যে ভারী বুটজুতোর শব্দ?

যেখানে এসে পড়লেন, সেখানটা এই মস্ত ফ্ল্যাট বাড়ির পিছন দিক, যত রাজ্যের বাথরুমের নর্দমার মুখ। সবখানে নোংরা জল থই থই করছে, জমাদারটা যে কিছু কাজ করে না তা বোঝাই যাচ্ছে। অন্য সময় হলে এরকম নোংরা জায়গায় পা দেবার কথা ভাবতেই পারতেন না গুপিবাবু, কিন্তু এখন তো আর মাথার ঠিক নেই। এখন শুধু চিন্তা—কেউ না দেখতে পায়।

ওই নোংরা গলিটা দিয়ে বেরোতে হলেও যে ঘুরে সামনের গেট দিয়েই বেরোতে হয়, গুপি মোক্তারের এটা জানা ছিল না, ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পাক দিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখেন, ওরে বাবা, সামনে সাক্ষাৎ যম। গেটের সামনে পুলিসের সেই জালঘেরা কালো গাড়ি একখানি গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

গুপি মোক্তার পিছু হঠতে থাকেন।

হঠতে হঠতে আবার সেই নোংরা গলিতে গিয়ে পড়েন, আর এখন গুপি মোক্তারকে ঠিক একটি পাকা চোরের মতো দেখতে লাগে। কারণ গুপি এখন পাঁচিল ডিঙোবার তাল করছেন।

ছাত থেকে নেমে আসা রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে খানিকটা উঠে গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পাঁচিলের উপর গিয়ে পড়লেন গুপি! এখন ওদিকে নেমে যেতে হবে ঘষটে, ছেঁচড়ে, যে করে হোক। খুব বেশি উঁচু পাঁচিল নয়, এই যা।

কিন্তু অন্য বিপদ আছে।

পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাঁচের টুকরো পোঁতা। তার মানে ঘষটে নামতে গেলে জামা ছিঁড়বে, বুকের ছাল-চামড়া ছিঁড়ে ওয়াড় হয়ে যাবে। কিন্তু গেলেই বা কী? পালাতে তো হবে।

বেভুল হয়ে যাওয়া গুপি মোক্তারের এখন মাথার মধ্যে পিন-ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত ওই একটা কথাই বেজে চলেছে, পালাতে হবে। যেন 'ভূত' হয়ে যাওয়া গজপতি উকিল তাঁকে তাড়া করেছে।

যে থলিটায় কাপড়-লুঙ্গি নিয়েছিলেন গুপি মোক্তার, সেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ওই ভাঙা কাঁচের খোঁচার উপর পেতে আস্তে পাঁচিলে বুক রেখে সাবধানে ওপারে নেমে পড়লেন। যদিও ধুপ করে একটা শব্দ হল, আর বুকটাও কিছু জখম হল, তবু হাত বাড়িয়ে থলিটা নিয়ে চটপট এগিয়ে গেলেন।

ফ্ল্যাট-বাড়ির পিছন দিকটায় যে একটা বস্তি আছে তা জানতেন না গুপিবাবু, তাকিয়ে দেখেনওনি কোনোদিন। এখন এর মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে অবাক হলেন। অত ভাল ফ্ল্যাট-বাড়িটার পিছন

দিকটা এমন নোংরা গলি, পচা গন্ধ !

নাকে রুমাল চেপে গলিটা পার হয়ে গেলেন গুপি মোক্তার। এখন কোনো মতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পড়ে, যে কোনো একটা ট্রেনে চেপে কলকাতা-ছাড়া হওয়া ! তারপর যা আছে অদৃষ্টে।

খুনের ব্যাপারটা পুরনো হয়ে গেলে, আর তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনের গা-ছমছমানি কমলে, তবে ফেরা যাবে।

ততদিনে নিশ্চয় খুনী ধরা পড়বে। হয়তো তার ফাঁসিও হয়ে যাবে। তখন আর গুপি মোক্তারের গামছার কথা উঠবে না।

মনটা একটু নিশ্চিন্ত করে জোরে-জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন গুপি।

২

"পাখি উড়ে গেল রে মদনা।"

বস্তির মধ্যে দাওয়ায় বসে ট্যাঁপা আর মদনা ভাঙা কলাইকরা বাটিতে চা খেতে খেতে নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলাবলি করছিল।

"মানুষজন ভারী চালাক হয়ে গেছে আজকাল, বুঝলি? হয় পকেট গড়েরমাঠ করে রেখে দেবে, নয় পকেটের ওপর যেন একশো জোড়া চোখের পাহারা বসিয়ে ঘুরবে। ভাল-মতো একখানা পকেট কতদিন মারিনি বল্ তো?"

ট্যাঁপার আক্ষেপে মদনাও হতাশ-হতাশ গলায় বলে, "যা বলেছিস! পয়সাকড়িওলা লোকগুলো যে কেন এত নিষ্ঠুর হয়! তোদের কত আছে, তবু পয়সার কী মায়া! আচ্ছা আমাদেরও তো খেতে পরতে হবে? না কি হবে না?"

"সেই তো। বাজার বড়ই খারাপ। টাকাওলা লোকগুলোকে দেখলে এত হিংসে হয়!" বলল মদনা।

ট্যাঁপা বলল, "তবে আবার টাকা থাকার বিপদও আছে·

রে। দেখলি তো চোক্ষের সামনে আজ? দিন-দুপুরে খুন হয়ে গেল উকিলবাবুটা। টাকার জন্যেই তো?"

"তা বটে। শুনেছি নাকি হাড়-কেপ্পন ছিল লোকটা। কষ্ট করে কাটিয়ে সব টাকা জমিয়েছিল।"

"হাতে টাকা নিয়ে মানুষ যে কী করে কেপ্পন হয় ব মদনা!" ট্যাপা নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার যদি অনেক টাকা থাকত, দেখিয়ে দিতাম খরচা করা কাকে বলে!"

কথার মাঝখানে হঠাৎ দু'জনেরই চোখ কপালে ওঠে।

কে ও?

ফ্ল্যাট-বাড়ির পিছনের পাঁচিলে বসে পাঁচিল টপকাবার জন্যে লড়বড় করছে।

ট্যাপা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মদনাকে চেঁচাতে বারণ করে নিঃশব্দে চোখ ড্যাবা করে তাকিয়ে থাকে। হুঁ, লোকটা পাঁচিল টপকাল। থলির মতো কী একটা টেনে নামিয়েও নিল। তার মানে চোর! ট্যাপা-মদনার মতে চোর নিকৃষ্ট জীব, উঁচুদরের মানুষ নয়।

চোরকে পকেটমাররা খুব নিচু চোখে দেখে।

ট্যাপারাও দেখল।

নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছে তারা, দেখতে হবে কে লোকটা।

মদনা ফিসফিস করে বলে, "ব্যাটা তাহলে সেই খুনে। দুপুরে কাজ সাঙ্গ করে মালপত্তর নিয়ে পেছনের নোংরা গলিতে লুকিয়েছিল, এখন সন্ধের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার তাল।"

"আমরা কি চেঁচাব?" বলল ট্যাঁপা।

মদনা বলল, "এই, খবরদার। কেন মিথ্যে ঝামেলা বাধাবি? দেখবি তাহলে পুলিস এসে আমাদের ধরবে।"

"তাই বলে হত্যেকারী সামনে দিয়ে চলে যাবে?"

"যেতে দে!"

তারপরই চমকে ওঠে তুজনে।

আরে চোর কোথায়! এ যে সেই গুপি মোক্তার। গজ উকিলের পাশের পড়শি! রোজ তুজনে নাকি দাবা-খেলা চলে। মানে চলত।

আর চলবে না। উকিল তো পরপারে চলে গেল।

হঠাৎ তুই বন্ধুরই চোখ গুলি হয়ে ওঠে, আর মাথার চুল হরিসংকীর্তন করতে শুরু করে।

"ট্যাঁপা, বুঝেছিস?"

"বুঝলাম রে মদনা।" ট্যাঁপা আস্তে আস্তে বলে, "প্রাণের বন্ধুটিকে খতম করে এখন মালপত্তর নিয়ে হাওয়া হচ্ছেন।"

এই কথা-টথার মাঝখানে সামনে দিয়ে তড়বড় করে এগিয়ে গেলেন গুপি মোক্তার।

ট্যাঁপা বলল, "পাখি উড়ে গেল রে মদনা।"

উত্তেজনায় ওদের মাথা চক্কর খেয়ে উঠল। সামনে দিয়ে একটা চেনাশোনা খুনী আসামী চোরাই মাল নিয়ে ভেগে যাবে—আর ট্যাঁপা মদনা জুল্‌জুল্ করে তাকিয়ে দেখবে?

অথচ দেখছেও তাই।

যাচ্ছেই লোকটা ভেগে।

"মদনা!"

ট্যাপা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "লোকটা কী রকম চালাক দেখেছিস? বাক্স নয়, সুটকেস নয়, সেরেফ একটা চটের থলি। যাতে কেউ না সন্দেহ করতে পারে।"

মদনা ট্যাপার গায়ে একটা খামচি কেটে বলে, "বাটপাড়ি কি নিচু কাজ ট্যাপা?"

ট্যাপা গম্ভীর গলায় বলে, "তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে নিচু নয়। বরং উঁচু দরেরই। লোকটার পাপের বোঝা একটু হালকা করে দেওয়া হবে।"

"তবে চল্।"

"চল্।"

তড়াক করে দাওয়া থেকে লাফিয়ে পড়ে নিঃশব্দে হন হন করে এগিয়ে যায় দু'জনে।

গুপি মোক্তারকে ধরে ফেলতে আর কতক্ষণ? ওদের হল পকেটমারের পা।

পরদিন সকাল।

হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটতে লম্বা লাইন।

তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্গাপুরের ট্রেনের একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে চটপট এগিয়ে গেলেন গুপি। এই গাড়িটাই এক্ষুনি ছাড়বে।

কোণের দিকের একটা সিটে বসে পড়ে কপালের ঘাম মুছে

একটু নিশ্চিন্তির নিশ্বাস ফেললেন গুপি মোক্তার। যাক, এতক্ষণে একটু বাঁচা গেল। ভূতেরা কি রেলগাড়ি চাপে ? বোধহয় নয়। তা'হলে আশা হচ্ছে এবার বাঁচা গেল। উঃ, সারাক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছিল, পিছনে পায়ের শব্দ, কে যেন পিছু পিছু আসছে।

আর কে ?

গজপতি উকিলের প্রেতাত্মা ছাড়া ?

ভাল করে গুছিয়ে বসে গুপি মনে মনে বলেন, খেলায় হারজিত আছেই, আমি যে কেবলই জিততাম, আর তুমি মশাই কেবলই হারতে, তার জন্যে কি আমি দায়ী ? ওসব তো লাক্-এর ব্যাপার। বুদ্ধিরও। তা' বলে তুমি মরে ভূত হয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে ?...

যাক্ আর শোধ নিতে হবে না। এবার মিটে গেল। রেল-গাড়িতে তো আর পরলোকগতরা আসে না।

নিশ্চিন্তির নিশ্বাস ফেলার পর হঠাৎ পিসির আনন্দনাড়ুর কথা মনে পড়ে মনটা হায় হায় করে উঠল গুপির। ইস্, খেয়ে এলেই হত। এখন কখন কী জুটবে কে জানে। টাকা-পয়সা যা আনা হয়েছে, তা' টিপে টিপে খরচা করতে হবে।

সেইটুকুই তো সর্বস্ব।

সেই চটের থলিটা বাগিয়ে ধরে কোলের কাছে টেনে নিলেন গুপি মোক্তার, বলা যায় না কে কখন চক্ষুদান করে বসে।

সামনের বেঞ্চের কোণে যে তুটো ছেলে বসে বসে চিনে বাদাম ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে খাচ্ছিল, তারা তু'জনে তুজনকে চিমটি কাটল। যার মানে হচ্ছে, 'বুঝতে পারছিস ?'

বুঝব না আবার কেন ? আসল মাল ওইটির মধ্যে।

স্টেশন থেকে একখানা দৈনিক বার্তাবহ কিনেছিলেন গুপি, সেইটাকে মুখের সামনে ধরে বসে চোখ বুলিয়েই চলেছিলেন।

ঠিক পলাতক আসামীরা যেমন করে।

গুপি-মোক্তার আসামী না হলেও পলাতক তো বটে।···অতএব পলাতকদের মনের মধ্যে যা হয়, তাঁর মনের মধ্যেও তাই হচ্ছিল। যাতে অন্যেরা তাঁর মুখ দেখতে না পায়, এবং তিনি অন্যদের মুখের ভাব দেখতে পান। তাই দেখতে পাচ্ছিলেন 'চিনেবাদাম খাওয়া' ছেলে দুটো যেন কেবলই তাঁর দিকে যাকে বলে কটাক্ষপাত করছে। আবার নিজেদের মধ্যে কী যেন ইশারাও করছে।

কারণ কী?

ওদের গুপি জীবনেও চোখে দেখেননি।

তবে?

ওরা কি তবে পুলিসের চর?

আবার বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল করে উঠল। ভাবলেন, সামনে যে স্টেশনটা পড়বে, সেটাতেই নেমে পড়বেন। টুক করে একবার নেমে পড়েই ভিড়ে মিশে অন্য কামরায় উঠে পড়বেন।

থলিটা বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন গুপি।

ছেলে হুটো জানলার বাইরে মুখ রেখে চিনেবাদাম চিবোচ্ছে। ভালই হয়েছে। এখন একটা স্টেশন এলে হয়।...

স্টেশন এল।

গাড়ি থামল। কিন্তু এমনি কপাল গুপি মোক্তারের যে, হবি তো হ' কিনা বর্ধমান! তার মানে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ি। কামরা স্বুদ্ধ লোক নেমে পড়ে খেতে ছুটবে।

শুধু যে সীতাভোগ মিহিদানা তা' নয়, হ্যাংলার মত যা পাবে তাই গিলবে। মাটন কাটলেট, ফিশ চপ, ফুলকপির সিঙ্গাড়া, খাস্তা কচুরি, আলু মটরের ঘুগনি, কলাইডালের ফুলুরি, আরও কত কী!

আশ্চয্যি বাবা, এত সব খেতে ইচ্ছে করে লোকের? করেই তো দেখা যাচ্ছে। ওসব জিনিস তো বটেই, কাঠের থালায় সাজানো পোকাধরা ছোলাসেদ্ধগুলো পর্যন্ত ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে। এমন কী, তাতে গোঁজা কাঁচালঙ্কাগুলো এবং পাকা-পাকা পাতিলেবুর টুকরো-গুলো পর্যন্ত।

বাবা কী পেটুক সব! প্ল্যাটফর্ম স্বুদ্ধ লোক সবাই যেন এক একটি বকরাক্ষস। কথাটা ভাবতে গিয়েই কিন্তু তাঁর নিজেরই পেটের মধ্যে একটি বকরাক্ষস 'সব খাই সব খাই' করে ওঠে। তাঁরও সব কিছুই খেতে ইচ্ছে করে হাঁউ হাঁউ করে।

সেই গতকাল ছুপুরে পিসির ডাকাডাকিতে খেলা ছেড়ে উঠে এসে ভাত খেয়েছিলেন, তারপর থেকে স্রেফ ছু' এক ভাঁড় চায়ের ওপর আছেন।

রাত্রে ওয়েটিং রুমের একটা বেঞ্চে শুয়ে থেকেছেন, আর পেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করেছেন। হাতের কড়ি

খরচা করে খেয়ে নিলে তো চলবে না, এখন দূরে পালাতে হবে তো।

হায়! হায়! আনন্দনাড়ু ক'টা যদি এই থলিটায় ফেলে নিয়ে চলে আসতেন! আচ্ছ, গুপিকে হঠাৎ হাওয়া হতে দেখে পিসি কী ভাববে?

পিসিও হঠাৎ সন্দেহ করে বসবে না তো গুপিকে? না, সে অসম্ভব।

কিন্তু এ কী জ্বালা হল আমার।

নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন গুপি-মোক্তার, কোনো দোষে দোষী নই, অথচ খুনে গুণ্ডার মতো ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তবে কি ফিরেই যাব?

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ওরে বাবা! গেলে তো সেই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে?

থলিটি বাগিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে পঞ্চাশ পয়সা খরচ করে এক পাতা ছোলা সেদ্ধ কিনলেন গুপি, আর পঁচিশ পয়সার এক ভাঁড় চা।

তবু যাক্ পুরো টাকাটা গেল না।

গাড়ি এখন অনেকক্ষণ থেমে থাকবে, গুপি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু সরে গিয়ে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে ছোলাসেদ্ধ চিবোতে লাগলেন। মন্দ লাগছে না। বড় হয়ে গিয়ে পর্যন্ত এ জিনিস তো কই আর খেয়েছেন বলে মনে পড়ছে না। নাঃ, বেশ তোফাই লাগছে; তাছাড়া আরও একটা সুবিধে, এই

পোকা-পোকা গন্ধ (ছেলেবেলায় গুপির বাবা যাকে ঘোড়ার ছোলা বলতেন) ছোলাসেদ্ধ একপেট খেয়ে থাকলে নির্ঘাত তিনটি বেলা আর কিছু খেতে হবে না। পেট ভার থাকবে, কামড়াতেও পারে। তার মানে অন্তত আর তিন বেলা পয়সা খরচ নেই।

ছোলা শেষ হলে, নুন-ঝালের পাতাটা চেটে চেটে সাফ করছিলেন গুপি, হঠাৎ দেখলেন চোখের সামনে দিয়ে গদাই লস্কর চালে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল।

সেরেছে!

এখন উপায়?

দুর্গাপুরের টিকিটটা গুপিবাবুর পকেটে পড়ে রইল, আর ওঁকে না নিয়ে ট্রেনটা দিব্যি বেরিয়ে গেল! গুপিবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ভাবলেন, পৃথিবীটাই বিশ্বাসঘাতক। নইলে গাড়ি একটা জড় পদার্থ, সেও এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে? কিন্তু—

গাড়ি কি জড় পদার্থ?

গুপি-মোক্তার ভুরু কোঁচকালেন, ভুরুর সঙ্গে নাকও। ভাবলেন, গাড়িকে কী করেই বা জড়পদার্থ বলা যায়? গাড়ি চলে। রীতিমত চলে। বিশেষ করে রেলগাড়ি, 'চলে' বললে কিছুই বলা হয় না, ছোটে। তাছাড়া ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে, কু করে ডাকে, এবং কোর্টের বিপিনবাবুর মতো গলগলিয়ে ধোঁয়াও ছাড়ে নাক-মুখ দিয়ে।

তবে? নাঃ, রেলগাড়ি জড়পদার্থ নয়।

আর সেই জন্যেই এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল।

একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে গুপি-মোক্তারের হঠাৎ দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেল। আচ্ছা, আমার কাছে দুর্গাপুরই বা কী আর

বর্ধমানই বা কী? কোনোখানেই তো কেউ নেই আমার। তবে এখানেই থেকে যাই। তাই ভাল। হ্যাঁ, বেশ ভাল। এখানে কিছুতেই আর সেই চিনেবাদাম খাওয়া ছেলে দুটোর প্যাটপ্যাটে চোখ দেখতে হবে না।

ভারী আরাম বোধ করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে লাগলেন গুপি।

আর একবার পিসির কথা মনে পড়ল। বুড়ি বোধহয় কান্নাকাটি করছে। যাক্ গে, কী আর করা! মলয়কুসুম রয়েছে এই যা ভরসা।

ট্যাঁপা আর মদনার দাঁতেরা চিনেবাদাম চিবোলেও চোখ চারখানা লক্ষ্যে স্থির ছিল। গুপি যখন নেমেছেন, ওরাও তখন নেমে পড়েছে। গুপি যখন ছোলা কিনেছেন, ওরাও তখন ঝালমুড়ি কিনেছে।

একটা সুবিধেও হয়ে গেছে।

এক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি দু' চাঙারি সীতাভোগ আর মিহিদানা কিনে নিচ্ছিলেন, পকেট থেকে পার্স টা বার করে মিষ্টিওলার ঠেলাগাড়ির ওপর রেখেছেন, সেই ফাঁকে ট্যাঁপা তা থেকে একখানি দশ টাকার নোট সরিয়ে নিয়েছে।

এখন দু' চারদিন চলে যাবে।

ঝালমুড়ি চিবোতে-চিবোতে ওরা দেখল, ট্রেন ছেড়ে দিল, গুপি মোক্তার উঠলেন না। কাজেই ওরাও উঠল না।

মদনা বলল, "দূরে থেকে 'ফলো' করতে হবে, লোকটার আমাদের ওপর সন্দ হয়েছে।"

ট্যাঁপা হতাশ গলায় বলে, "কতদিন যে ভোগাবে কে জানে!

'মালকড়ি'গুলো ওর ওই চটের থলিতেই আছে না আর কোথাও রেখে এসেছে তাই বা কে জানে!"

মদনা বলে, "উঁহু, আর কোথাও না। দেখছিস না সবসময় কেমন বুকে আগলে ধরে রেখেছে!"

টঁ্যাপা উদাস মুখে বলে, "পৃথিবীতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না রে মদনা। জগতে এত টাকা, বস্তা বস্তা টাকা, পাহাড় পাহাড় টাকা, তার থেকে সামান্য দু-চার টাকা পেলেই আমাদের জীবন চলে যায়, অথচ দ্যাখ্, তাও জোটে না। ওই ভদ্দরলোকের মনিব্যাগটার পেটটা যে কী মোটকা ছিল রে মদনা, তোকে কী বলব। যেন বর্ষার রাতের কোলাব্যাঙ!"

মদনা রাগ-রাগ গলায় বলে, "তবে একটা মাত্তর নোট নিলি কেন? সবটা সাঁটলেই হত।"

টঁ্যাপা বলে, "খেপেছিস? তাহলে হৈচৈ পড়ে যেত না? আর ধরতে পারলে এই পেলাটফরম সুদ্ধ লোক আমায় বিন্দাবন দেখিয়ে ছাড়ত না?...একটা নোট ব্যাগ থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল, তাই। বাবু বোধহয় মিষ্টিওলাকে দেবে বলে বার করছিল—"

ঝালমুড়ির ঠোঙা দুটো ফেলে দিয়ে দু'জনে আবার নিঃশব্দে হন হন করে হাঁটতে থাকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়!

"খবরের কাগজে হয়তো 'পুরস্কার' ঘোষণা করেছে," মদনা ফিসফিস করে বলে, "হয়তো লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে

হাজার দু'হাজার পাওয়া যেত।"

ট্যাপা অবহেলাভরে বলে, "তা সে আর কে জানতে পারছে? তোরও যত বিদ্যে আমারও তত বিদ্যে! কাগজটা পড়বে কে? ওসব কিছু না, ওই চটের থলিটা হাতাতে পারলেই বাকি জীবন কেটে যাবে।"

"কত আছে বলে মনে হয় তোর ট্যাপা?"

"দশ-কুড়ি হাজার কি আর না হবে?"

মদনা মলিন মুখে বলে, "তবেই তো মুশকিল। গুনে ঠিক করবে কে?"

"তুই থাম তো মদনা—"

ট্যাপা আবার বলে, "গুনে ঠিক করবার দরকার কী? বলি গুনতে না জানলেও খরচা করতে তো জানিস? না কি ভাগ নিয়ে ঝগড়া করবি?"

মদনা আধহাত জিভ বার করে বলে, "তুই আমায় ভেবেছিস কী ট্যাপা? চিরকালের বন্ধু না আমরা?"

ট্যাপা উদাস মুখে বলে, "গজ উকিল আর গুপি মোক্তারও বন্ধু ছিল রে মদনা!"

মদনা গম্ভীর গলায় বলে, "বড়লোকের কথা বাদ দে।"

৩

গেন্নুপিসিও ঠিক তখন ওই কথাটাই বলছিলেন। অবিশ্যি 'বড়লোক' বলেননি, বলছিলেন "গুপে? গুপের কথা বাদ দিন বাছা! ওর মতিগতির কোনো ঠিক নেই।"

কাকে বলছিলেন?

বলছিলেন স্বয়ং পুলিস ইন্সপেক্টর কেবু ঘোষকে।

গুপি মোক্তারের ভয় তো আর মিথ্যে নয়, পুলিস তো আগে তাঁর বাড়িতে এসেই জেরা করেছে।

গতকালই এসেছিল, কিন্তু গেন্নুপিসি ঝেড়ে জবাব দিয়েছিলেন, "ভাইপো বাড়ি নেই, আমার এখন আহ্নিকের সময়, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করতে আসবেন না।"

তবু ফ্যাচফ্যাচ করেছিল সে। "তা' তিনি গেছেন কোথায়?"

গেন্নুপিসি রেগে টং হয়ে বলেছিলেন, "কোথায় যাচ্ছে তাই যদি বলে যাবে তো আমার এত জ্বালা কেন বাছা?"

"সাধারণত কোথায় যান?"

গেন্নুপিসি কড়া গলায় বলেন, "তার কোনো ঠিক আছে? যেদিন যেখানে ইচ্ছে যায়।"

"তা' ফেরেন কখন?"

"বলি তারই কোনো ঠিক আছে?" গেন্নুপিসি হাঁড়িমুখে বলেন, "এখনকার ছেলেপুলে একদণ্ড বাড়ি থাকতে চায়? যতক্ষণ পারে বাড়িছাড়া হয়ে থাকাই একালের ছেলেপুলের স্বভাব।"

কাল কেবু ঘোষ আসেননি, এসেছিল আর একজন কে। গেন্নুপিসির কথায় হেসে ফেলে বলে উঠেছিল, "শুনলাম তো গুপিবাবু গজপতি উকিলেরই সমবয়সী, তার মানে বছর পঞ্চাশ বয়েস। তিনি আবার একালের ছেলে হলেন কী করে?"

একথার পরেও গেন্নুপিসি মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবেন এমন আশা করা যায় না। রাখেননি। রাগে গরগরিয়ে বলেছেন, "দেখ বাছা, অনেকক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করেছি, আর নয়, গুপি আমার ষেটের কোলে এই ক'টা মাস হল মাত্তর উনপঞ্চাশে পড়েছে, আর তুমি ওকে পঞ্চাশে পাঠিয়ে দিচ্ছ? বাছার বয়স খুঁড়ো না বাপু!"

তবু সে লোক বলেছিল, "বেশ, নাহয় তেনার বয়েস বায়ো-তেয়োই হল, কিন্তু গজপতিবাবুর সঙ্গে ভাব তো ছিল?"

তখন গেন্নুপিসি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "মলা, মলা, একটা পুলিস ডাক তো! বাড়িতে একটা বেটাছেলে নেই, মাত্তর তুই একটা বাচ্চা ছেলে, আর আমি একটা অবলা মেয়েমানুষ। আর এই

লোক কিনা জেরা করে জ্বালিয়ে মারছে!"

পুলিস ডাকার কথা শুনে সেই ছোট ইন্সপেক্টর হতভম্ব হয়ে চলে গিয়েছিল। আজ বড় ইন্সপেক্টর কেবু ঘোষ এসেছেন জেরা করতে।

ভার-ভারিক্কে লোক, প্রথমেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, "গুপিবাবু আপনার আত্মীয়?"

গেন্নুপিসিও গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনার ছেলে আছে?"

উনি ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, "একথার মানে?"

"মানে হচ্ছে, আপনার ছেলে যদি আপনার আত্মীয় হয় তো গুপিও আমার আত্মীয়।"

"ওঃ! উনি আপনার ছেলে।"

গেন্নুপিসি বলেন, "ছেলে আর ভাইপোতে তফাত কী, বাছা?"

"ওঃ! তাই বলুন, ভাইপো! তা বেশ। আপনিই বুঝি ওঁকে মানুষ করেছেন?"

গেন্নুপিসি কড়া গলায় বলেন, "মানুষ করেছি, কী ভূতপ্রেত করেছি সে কথায় কাজ কী? আপনার যা জানবার সাফ-সাফ বলে যান। মানুষ হলে কি আর আনন্দনাড়ু ক'টা ফেলে রেখে চলে যায়?"

কেবু ঘোষ বলেন, "ও, চলে গেছেন! কখন চলে গেছেন?"

"সেই কথাই তো বলছি," গেন্নুপিসি ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, "জল চাইল, বললাম, শুধু জল খাবি? তাই কৌটো খুলে ক'টা আনন্দনাড়ু বার করে আনতে গেলাম। তাড়াতাড়ির সময় যা হয়, কৌটোটাও বিগড়ে বসে। খুলতেই চায় না। খুন্তি দিয়ে চাড় মেরে তবে খুলে নিয়ে এসে দেখি, বাবু হাওয়া!"

"ও! সেই অবধি আর ফেরেননি?" কেবু ঘোষ গোঁফের ফাঁকে হেসে বলেন, "এটা বোধহয় গতকাল বিকেলে?"

গেন্নুপিসি ভরাট গলায় বলেন, "তবে আর বলছি কী? বুড়ো পিসিটা যে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে, সে জ্ঞান নেই। সাধে আর বলছি—মানুষ করেছি না ভূত-প্রেত করেছি জানিনে।"

কেবু ঘোষ এবার একটু ধমকের সুরে বলেন, "বাজে কথা থামান। স্পষ্ট বলুন, গুপিবাবু রোজ গজপতিবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে যেতেন কিনা?"

গেন্নুপিসি কটকটিয়ে বলে ওঠেন, "না গেলে ছাড়ত! লোকটা মরে গেছে, সগ্‌গে কি নরকে, যেখানে হোক গেছে, বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না তবু বলি, লোক বড় 'ইয়ে' ছিল। রাতদিন ডাকাডাকি, গুপি গুপি! ওর যেন খেয়ে-শুয়ে কাজ নেই!"

কেবু ঘোষ আবার ধমক দেন, "দাবা খেলতে যেতেন, কেমন? ঠিক কিনা?"

"আমি বলেছি বেঠিক?"

"হুঁ! কালও গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলই তো। ডেকে ডেকে ভাত খাওয়াতে নিয়ে আসি।"

"কে ডাকতে গিয়েছিল?"

"কে আবার?" গেন্নুপিসি আরও চড়া গলায় বলেন, "এই আমি। নইলে সেই বুড়ো আমার বাছাকে ছাড়ত? চাকরকে তো ডোণ্টো কেয়ার করে।"

"আপনি যখন গেলেন, দু'জনকে কী অবস্থায় দেখলেন?"

গেন্নুপিসি বলেন, "শোনো কথা, অবস্থা আবার কী? দুই খোকায় ছক্ পেতে ঘুঁটি সাজিয়ে বসে আছেন এই তো দিশ্য।"

কেবু ঘোষ গোঁফে তা' দিয়ে বলেন, "হুঁ। তা আপনি ডেকে আসবার কত পরে গুপিবাবু ও-ফ্ল্যাট থেকে চলে এসেছিলেন?"

গেন্নুপিসি চোখ কপালে তুলে বলেন, "কত পরে মানে? আমি ডাকতে যাবার পর আরও বসে থাকবে, এত সাধ্যি হবে ওর? আমার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে এসেছে।"

কিন্তু কেবু ঘোষ কি এইটুকুতেই ছাড়বেন? গুপি মোক্তারের নাড়িনক্ষত্র সব জেনে নেবেন না? তারপর কী করেছিলেন তিনি, তারপর কী করেছিলেন, তার আগে কী করেছিলেন, সারাজীবন কী করতেন, সব জিজ্ঞেস করবেন না?"

গেন্নুপিসি ঠকঠক করে সব কিছুরই উত্তর দিচ্ছিলেন, কিন্তু কেবু ঘোষ যখন বললেন, "আসল কথাটা আমি বলব?···আপনি যখন ভাবছেন আপনার ভাইপো খেয়ে-দেয়ে ঘুমোচ্ছেন, তখন তিনি চুপিচুপি উঠে, বন্ধুর গলায় একটি ফাঁস লাগিয়ে তাঁর চাবিটি নিয়ে সর্বস্ব হাতিয়ে বাড়ি ফিরে ভাল মানুষের মত আবার শুয়ে পড়েছেন। তারপর—"

তখন গেন্নুপিসি চেঁচিয়ে হাঁক পেড়েছেন, "মলা! এ পুলিস ডাকার কম্মো নয়। জজ ডাক। অ্যাঁ, বলে কিনা গুপী আমার খুন করে এসে আবার ভালোমানুষের মতো—ওরে মলা, জজ না পাস, কোনোখান থেকে একটা মন্ত্রী-মান্ত্রা ডেকে আন। এ অত্যেচার আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে বাবা রে, বাছা আমার শোকে-তাপে বেভ্যুল হয়ে নিরুদ্দিশ হয়ে গেল, আর বলে কিনা সেই খুন করেছে—ও মাগো—"

এমন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন গেন্নুবালা যে পাড়ার লোক ছুটে এল। দেখেশুনে কেবু ঘোষ তখনকার মত বিদায় নিলেন।

বাইরে এসে অবশ্য আবার মলয়কুসুমকে ধরেছিলেন।

"নাম কী তোমার ?"

মলয় টান টান হয়ে উত্তর দিল, "শ্রীমলয়কুসুম দাস রায়।"

"এখানে কী কর ?"

"কী না করি, সেটাই বরং জিজ্ঞেস করুন।"

"সোজা করে জবাব দাও", কেবু ঘোষ ধমক দিয়ে বলেন, "পাশের ফ্ল্যাটে কাল একটা খুন হয়েছে তা জানো ?"

"আজ্ঞে সন্ধেবেলা বেড়িয়ে ফিরে জানলাম।"

কেবু ঘোষ আরো ধমকে বলেন, "কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে ?"

মলয়কুসুম মাথা চুলকে বলে, "আজ্ঞে পুরনো পাড়ায়, তাস খেলতে।"

"এসে তোমার বাবুকে দেখেছিলে ?"

"আজ্ঞে না।"

"তার মানে, খুনের পর তিনি ফেরার হয়েছেন ?"

মলয়কুসুম ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে মাথা হেলিয়ে বলে, "আজ্ঞে,

হিসেবমত তাই দাঁড়াচ্ছে।"

"তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে না, খুনটা উনিই করেছেন?"

মলয়কুসুম আধহাত জিভ বার করে বলে, "খেপেছেন? বাবু করবেন মানুষ খুন? বলে একটা মশা-ছারপোকাকে খুন করার দরকার হলে, মাঝরাত্তিরে আমায় ডাক পাড়েন।"

কেবু ঘোষ গোঁফ ঝুলিয়ে বলেন, "হুঁ, তুমিও একটি ঘুঘু বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞে যেখানেই থাকি, সেটাই বাড়ি।"

"ফের বাজে কথা? দেশের বাড়ি কোথায়?"

মলয়কুসুম মনমরা গলায় বলে, "আজ্ঞে সে শুনলে আপনার হাসি পাবে। গাঁয়ের নাম ব্যাদড়াপাড়া।"

কেবু ঘোষ কষ্টে হাসি চেপে বলেন, "ঠিক নাম! তা সে-দেশে তোমার এমন বাহারি নামটি কে রাখল?"

মলয়কুসুম এখন তার এক ফুট লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলে, "হুঁ! সেখেনে এই নাম? তাহলেই হয়েছে! এ আমার নিজের ছিষ্টি করা নাম! মা-বাপ তো নাম রেখেছিল 'পচা'।"

"বাঃ বাঃ, বেশ! তা বাপু, তোমার বাবু কোথায় যেতে পারে তোমার ধারণা?"

মলয়কুসুম গম্ভীর গলায় বলে, "ধারণার কথা বলতে নেই সাহেব, ভুল হয়।"

এত চালাক-চালাক কথা বলেও রেহাই পেল না বেচারা মলয়কুসুম। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। বাবুকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, চাকরকেই ধরা যাক। শুধু ওকেই নয়, এই ফ্ল্যাট-

বাড়ির অনেককেই ধরপাকড় করা হল। আস্ত একটা মানুষ খুন হওয়া তো চারটিখানি কথা নয়।

মলয়কে ধরে নিয়ে গেল দেখে গেনুপিসি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন।

আর কী করবার আছে?

অথচ বস্তিতে ট্যাঁপার মা, আর মদনার ঠাকুমা মুখে তালা-চাবি লাগিয়ে বসে আছে। ছেলে হারিয়ে গেছে, সে-কথাটি বলছে না। এখন যদি ছেলে-ছেলে করে কাঁদতে বসে, তাহলে তাদের উপরও হয়তো পুলিসের নজর পড়বে।

ওরা জানে না, এদিকে ট্যাঁপা-মদনাই স্রেফ ডিটেকটিভ পুলিসের মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে গুপি মোক্তার, সেখানে ওরা। তবে দূরে থেকে। দেখাটি দিচ্ছে না।

কিন্তু দেখতে না পেলেও কি কিছু টের পাওয়া যায় না?

কেউ পিছু-পিছু এলেই অনুভবে ধরা পড়ে। গুপি মোক্তারও তাই কেবলই অনুভব করছেন, পিছনে কার যেন পায়ের শব্দ, কোথায় যেন ফিসফিস গলার আওয়াজ।

কার? কার?

আর কার?

ভেবে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে গুপির। অপঘাতে মরলে তো মানুষ অপদেবতাই হয়।

অতএব দৌড় দৌড়।

যেদিকে দু'চক্ষু যায়।

মাঠ-ময়দান, ঝোপ-জঙ্গল, আমবাগান, কাঁঠাল বাগান, ভাঙা শিবমন্দির, পোড়ো বাড়ি, যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ছেন, ঢুকে

পড়ে কোথাও বসে হাঁপাচ্ছেন, শুয়ে পড়বেন ভাবছেন, আবার কেমন কেমন যেন আওয়াজ পেয়ে দৌড় মারছেন। দৌড় মেরে যে 'ওনা'দের হাত এড়ানো যায় না, এ খেয়াল হয় না গুপি মোক্তারের।

মাথার মধ্যে সেই পিন-ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডটা এখনো বেজেই চলেছে।

পালাই বাবা! পালাই বাবা!

রামনাম করে করে জিভ ব্যথা, খাওয়া-দাওয়া তো নাস্তি। দৌড় দিতে দিতে শহর অঞ্চল ছাড়িয়ে কখন যে বর্ধমানের সব গণ্ডগ্রামের মধ্যে ঢুকে ঢুকে পড়ছেন, তাও জানেন না। কখনো পাড়াগাঁয়ের কোনো পচা চায়ের দোকানে একটু চা আর দুখানা লেড়ো বিস্কুট, কখনো কোনো কোনো চালাঘরের দোকানে দশ-কুড়ি পয়সার মুড়ি-মুড়কি, কখনো কোনো 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' পাঁচসিকের ভাত-ডাল এই চলছে। কিন্তু আর কতদিন চলবে? কত টাকাই বা এনেছিলেন সঙ্গে?

৪

এদিকে ট্যাঁপা আর মদনা কাহিল হয়ে পড়ছে।

ট্যাঁপা বলে, "আর তো পারা যাচ্ছে না মদনা। ওই বেঁটে বুড়ো যে এতো দৌড় মারতে পারে, তা কে জানত।"

মদনা বলে, "যা বলেছিস ট্যাঁপা। হয়রান হয়ে যাচ্ছি। যেই ভাবি বুড়ো বোধ হয় এই-বার চান করতে যাবে, কি একটু ঘুমোবে, সেই দেখি চোঁ চোঁ দৌড় মারছে। না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে আর কত ঘুরে মরব!"

তা না-খাওয়া না-দাওয়াই বলতে হয়, সেই দশটা টাকা হাপিস করে ফেলার পর, ওরা আর-একদিন সোনাথলি গ্রামের এক হাটে ঘোরাঘুরি করে, একটা মুগ-কড়াইয়ের ব্যাপারীর তবিল থেকে কিছু

হাতিয়েছিল, তাতেই চলছে এতদিন। কিন্তু তাকে কি আর চলা বলে? সেও সেই গুপি মোক্তারের মতই। কোনোদিন মুড়ি চিঁড়ে, কোনোদিন বা পাইস হোটেল। সুবিধের মধ্যে ওই হাটেই সেদিন হাত সাফাই করে হু'জনে হুটো লুঙ্গি বাগিয়েছে, তাই চান করে নেবার সুবিধে হচ্ছে। নইলে চানই হচ্ছিল না প্রায়।

পাঁচ সাত দিন পরে পরে প্যান্ট শার্ট সমেত পুকুরে ডুব দিয়ে কি রাস্তার ধারের টিউবওয়েলে মাথা ভিজিয়ে, ভিজে জামা প্যান্ট পরেই ঘুরে ঘুরে গায়ে শুকিয়ে নিয়েছে। এখন তবু অসুবিধেটা ঘুচেছে।

ট্যাঁপা বলে, "আচ্ছা মদনা, এই যে আমরা না বলিয়া পরের দবিা তুলে নিচ্ছি, এতে কি আমাদের পাপ হচ্ছে না?"

মদনা বলে, "হলে হবে, কী করা যাবে? খেতে পরতে তো হবে? ওই হাটের লোকগুলো যে তিন টাকার জিনিস দশ টাকায় বেচছে, তাতে বুঝি পাপ হচ্ছে না?"

"হচ্ছে না কি আর? হচ্ছে। ভগবান টের পাচ্ছে।"

"তা ভগবান যদি টের পায় তো বুঝবে আমাদের অবস্থাটা কী।"

ট্যাঁপা একটু গুম হয়ে বলে, "আচ্ছা আমরা কেন ঘুরে মরছি বল দিকি?"

"ওই হত্যেকারী বুড়োকে ধরবার জন্যে আর ওর হাতের থলিটার জন্যে। আর কেন?"

"তোর কি মনে হয় ওতে সত্যি অনেক টাকা আছে?"

"না থাকলে আর এমন করে বুকে আগলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে?"

ট্যাঁপা আবার একটু গুম হয়ে থেকে বলে, "তবে বুড়ো এতটা

কষ্ট করছে কেন? টাকা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে না কেন?"

মদনা পকেটের চিরুনিটা বার করে জোরে জোরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, "আহা, এটা বুঝিস না, ওসব হচ্ছে একশো টাকা হাজার টাকার নোট, যেখানে সেখানে ভাঙাতে গেলে হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে। জানিস তো ওর নামে পুলিসের হুলিয়া বেরিয়েছে।"

ট্যাপাও চিরুনিটা বার করে।

ভাগ্যিস সবসময় পকেটে চিরুনি রাখা অভ্যেস, তাই এক কথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেও মাথাটা রক্ষে হচ্ছে। নইলে আবার হয়তো হুখানা চিরুনিও 'বাণিজ্য' করতে হত। বরং পেটে ভাত না পড়লে চলে। কিন্তু মাথায় চিরুনি না পড়লে তো আর চলে না।

চুলে চিরুনি চালাতে-চালাতে ট্যাপা বলে, "আর এভাবে ওত পেতে পেতে বেড়ানো যাচ্ছে না মদনা, বুঝলি? এবার কোনো ঝোপে-ঝাড়ে কি কোণে-খাঁজে হুজনে মিলে বুড়োর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে থলিটা কেড়ে নিয়ে সটকান দেওয়া যাক। হত্যেকারীকে আর ধরে কাজ নেই, অনেক ঝামেলা।"

মদনা বলে, "মন্দ বলিসনি। সত্যিই আর পারা যাচ্ছে না। ভাঙামন্দির কি পোড়ো বাড়ি দেখলেই বুড়ো খানিক খানিক আশ্রয় নেয় দেখেছি।"

"তা দেখেছি। কেড়ে নেওয়াটা কিছু না, তবে কাড়তে গেলে চিনে ফেলবে এই ভাবনা। পাড়ার লোক তো। আমরা এতদিন পাড়ায় নেই, কে জানে আমাদের নামেও হুলিয়া বেরিয়েছে কিনা।"

মদনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "ঠাক্‌মা বুড়ি কেঁদে কেঁদে মরেই গেল কিনা কে জানে। তোর মা—ও—"

টঁ্যাপা আরও গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার মার কথা বাদ দে। সৎমা তো। সে তো বলে, অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল।"

মদনা দুঃখু-দুঃখু গলায় বলে, "সে-কথা ঠাক্‌মাও বলে। এক-বার যদি অনেক টাকা পেতাম রে, পিথিবীকে দেখিয়ে দিতাম আমরাও কত ভাল ছেলে হতে পারি।"

সেই তো।

টঁ্যাপা চিরুনিটা ফের পকেটে রেখে দিয়ে প্যাণ্টে হাত মুছতে মুছতে বলে, "আমিও তো তাই ভাবি। ওই ঝাঁপিয়ে পড়াই ঠিক। ভেবে দেখেছি, বুড়ো আমাদের চিনে ফেললেও ধরিয়ে দিতে পারবে না। কার টাকা কে নিচ্ছে বল্? এটা চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়, বাটপাড়ি।"

"হঁ্যা হঁ্যা হঁ্যা! তাই তো! এটা খেয়াল ছিল না।"

দুই বন্ধুতে অনেকদিন পরে গলা খুলে হাসতে থাকে।

হাসির পর দুজনেই আবার পরামর্শ করে, আচ্ছা তারা যদি ওই চোরাই টাকাটা নিজেরা না নিয়ে টাকা-ফাকা সুদ্ধু স্রেফ আসামীটাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরে দেয়, পুরস্কার-টুরস্কার পাবে না? এমন কী পুলিসে একটা চাকরিও পেতে পারে। এ তো প্রায় ডিটেকটিভের মতনই কাজ হচ্ছে।

ভেবে খুবই উৎসাহ পায় দু'জনে।

বেশ খানিকক্ষণ ওই কথা নিয়েই চালায়, কিন্তু টঁ্যাপা হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, "আমাদের কি আর এ-জগতে কেউ বিশ্বাস

করবে রে? আমরা যে পকেটমার।"

মদনা রেগে উঠে বলে, "বাঃ, এরপর তো আমরা ভাল হয়ে যাব।"

ট্যাপা মলিন গলায় বলে, "হলেও। আসল কথা, জীবনের গোড়া থেকেই ভাল হতে হয়, বুঝলি? একবার খারাপ হলে, পরে কেউ আর তাদের বিশ্বাস করতে চায় না।"

মদনা মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, "ইস! গোড়া থেকে আমরা যদি পকেটমার না হয়ে বাজারের মুটে হতাম!"

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, "তা হোক, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিসের হাতে সমোপ্পন করে দিয়ে নিজেরাও আত্মোসমোপ্পন করব। যা থাকে কপালে। চল চল, বুড়ো আবার না চোখছাড়া হয়ে যায়। একটু আগে ওই পুকুরটার ধারে দেখেছি। এতক্ষণে বোধ হয় চান হয়ে গেল।"

"হয়নি। চান করে আবার বুড়ো সূয্যিমুখো হয়ে পুজো করে।"

"ঠিক আছে, চল পা চালিয়ে, একেবারে ক্যাঁক করে ধরে ফেলিগে। এখনো আছে তাহলে।"

তা সত্যি পুজোর অভ্যাসটা বজায় রেখেছেন গুপি মোক্তার, ওটা বরাবরের অভ্যাস। বাড়িতে ঠাকুরের ছবিতে ফুল দেন।

মাঝে-মাঝে মন কেমন করে, ভাবেন, কেন এমন বোকার মত ঘুরে মরছি, বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ভাবলেই আতঙ্ক আসে। মনে হয়, তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটাই যেন গলায় গামছা জড়িয়ে গোল গোল দুটো চোখ ঠিকরে তাকিয়ে বসে আছে।

কাজেই এলোমেলো ভাবে আরও গভীর গণ্ডগ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

কিন্তু ঢুকে পড়েও মহাবিপদ।

শহর অঞ্চলের লোকেরা অচেনা লোকের দিকে ফিরেও তাকায় না, কিন্তু গ্রামের লোকের চোখ-কান খাড়া।

কোন গাঁয়ে ঢুকে পড়েছে বুঝতে না পেরে গুপি মোক্তার যেই একদিন একজনকে জিজ্ঞেস করেন, "এই গাঁটার নাম কী মশাই?"

'মশাই' বলেই বলেন। চাষা-টাষা হলেও, না-বললে কী জানি বাবা কে খাপ্পা হয়ে উঠবে!

কিন্তু সে-লোক উত্তর না দিয়ে বলে উঠলো, "মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

গুপি মোক্তার থতমত খেয়ে বলেন, "ইয়ে—কলকাত থেকে—"

"অ। তা কাদের বাড়ি উঠেছেন?"

গুপি আরও বিপদগ্রস্ত হয়ে বলেন, "কারুর বাড়ি উঠিনি। মানে সামান্য কাজে এসেছি, আজই চলে যাব।"

"অ। তা কী কাজে আসা হয়েছে?"

গুপি এবার রাগ দেখিয়ে বলেন, "তাতে আপনার দরকার?"

সে লোক রাগে না। অমায়িক গলায় বলে, "আজ্ঞে রাগ করছেন কেন? কাজে এসেছেন বলছেন অথচ গাঁয়ের নামটাও জানেন না, কলকেতা থেকে এসেছেন অথচ সঙ্গে ব্যাগ সুটকেস নেই, শুদু একটা চিরকুট্টি চটের থলি। এমন তো দেখি না।"

শুনে গুপি মোক্তার গটগট করে চলে যান। ঠিক করেন, আর কাউকে গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করবেন না।

কিন্তু জিজ্ঞেস না করলেই বা কী?

এমনিই লোকে ওঁকে দেখে জিজ্ঞেস করবেই। "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

গুপি মোক্তার এখন আর কলকাতা বলেন না। চালাকি করে বলেন, "বর্ধমান থেকে।"

"এখানে কোথায় উঠেছেন?"

"ওই ওদিকে, হলদে-মতো বাড়িটায়।"

কিন্তু গাঁয়ের লোক এত সহজে ছাড়ে না। বেশ কাছে এগিয়ে এসে বলে, "হলদে বাড়ি? সে তো ওই ভূধর চাটুজ্যের বাড়ি। আপনি ওনাদের কুটুম বুঝি?"

গুপি মোক্তার কপাল ঠুকে বলেন, "হুঁ।"

"অ। তা নাম কী মশায়ের?"

গুপি মোক্তার যা ইচ্ছে একটা বানিয়ে বলেন, "মুকুন্দ মুখুজ্যে।"

"অ। তা কী কাজে আসা হয়েছে?"

"আপনার তাতে কী কাজ?"

বলে হনহন করে চলে যান বটে গুপি, কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপে। এক্ষুনি তো লোকটা ওই ভূধর না কার বাড়িতে খোঁজ নিতে যাবে।

কাজেই আবার পলায়ন। যেদিকে দু' চোখ যায়। ঝোপজঙ্গল ডিঙিয়ে ভাঙা-ভাঙা বাড়ির পাশ দিয়ে মজা পুকুরের পাড় দিয়ে।

কিন্তু আবার তো কোনো লোকালয়ে গিয়ে পড়তেই হবে? যেখানে অন্তত দু-একটা দোকান-টোকান আছে।

খেতে তো হবে কিছু।

তা তাতেও রক্ষে নেই, চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও চা-ওলা বলে উঠবে, "মশাই, কোতা থেকে আসতেছেন? কোনো দিন তো দেকি নাই এদিগরে?"

গুপি মোক্তার রেগে বলেন, "আগের দেখা না হলে চা পাওয়া যাবে না?"

"এই দেখেন! আপনি উত্তপ্ত হচ্ছেন। দেখি নাই তাই শুদুচ্চি। তা আসচেন কোথা থেকে?"

"বর্ধমান থেকে।"

"ও! ক'দিন থাকা হবে?"

"আঃ, এ তো মহা জ্বালা! চা পাওয়া যাবে কিনা?"

"কী মুশকিল! পাওয়া যাবে না কে বলছে। শ্যান না। তবে বলতে বাধা কী? কোন্ কাজে এদিকে আগমন?"

গুপি মোক্তার হতাশ গলায় বলেন, "আগে চা'টা দাও তো বাবা, গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সব বলছি—নাম কী, দেশ কোথায়, কোথা থেকে আসছি, এখানে কোন কাজে, কার বাড়িতে উঠেছি, কতদিন থাকব, কী চাকরি-বাকরি করি, রাশ গণ কী, সব বলব।"

বলেন না অবশ্য; চা খাওয়া হলেই হনহন করে চলে যান।

কিন্তু কোথায় চলে যাবেন?

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকেই যান, মুখের সামনে প্রশ্ন, "মশাই কি এখানে নতুন এসেছেন?"

ক্রমশ আর কেউ 'আপনি' করে বলছে না, বলছে 'তুমি'। প্রথম 'তুমি' বলল একটা মুড়িওয়ালী; বলল, "কোথা থেকে আসছ বাছা? এদিকে তো আগে দেকিনি।"

তারপর সবাই বলছে।

কোথাকার লোক হে? এখানে কোথায় উঠেছ? কাদের কুটুম? বসাক বাড়ির? ন্যাকি শাঁখারি বাড়ির?

প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন গুপি।

ফট্ করে 'তুমি' বলছে মানে? ক্রমে বুঝছেন এখন আর তাঁকে বাবু ভদ্দরলোক মনে হচ্ছে না।

তেল না মেখে-মেখে চুল রুক্ষু, নাপিতের অভাবে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ, না খেয়ে-খেয়ে রোগা হাড়গিলে চেহারা। আর বর্ধমানের রাঙামাটির গুণে কাপড়জামা প্রায় গেরুয়া। একদিন একটা ছোট্ট মুদির দোকান থেকে দশ পয়সা দিয়ে এক টুকরো সাবান কিনে নিয়ে জামাটা কাপড়টা পুকুরে কেচে নিয়েছিলেন, তাতে আরও লালচে মেরে গেল। পুকুরের জলটাও লালচে ছিল বোধ হয়।

বুঝেছেন, 'বাবু' বলবার চেহারা আর নেই।

এখন আর তাই 'তুমি' শুনলে চমকে ওঠেন না, বরং নিজেই কারুকে দেখলে আপনি-মশাই বলেন। বলেন, "ও মশাই, শুনুন, আমার নাম হচ্ছে গোবর্ধন গড়াই। বাড়ি পাঁচপাড়া, বয়েস সত্তর। কাজকর্ম কিছু করি না—"

যখন যা মুখে আসে বলেন।

কখনো বলেন, "নাম চরণদাস চাকলাদার, বাড়ি করঞ্জলি, এখানে কোনো কাজে আসিনি, শুধু বেড়াতে এসেছি।" কখনো ভজহরি সরখেল, কখনো জগদ্দল জানা, কখনো তপন তফাদার। বাড়ি কখনো পাটুলি, কখনো বীরভদ্রপুর, কখনো হাড়মাসড়া। বয়েস কখনো বত্রিশ, কখনো সাতচল্লিশ, কখনো সত্তর।

হঠাৎ বলে ওঠেন, "আগে থেকেই বলে রাখছি মশাই। আমার নাম অমুক—"

লোকে ক্রমশ পাগল ভাবতে শুরু করছে। একদিন কোনো গ্রামের এক ছোট্ট পানের দোকানে ঝোলানো সাড়ে তিন ইঞ্চি আরশিতে নিজের মুখ দেখে তো হাঁ। 'হাঁ'টাই সাড়ে তিন ইঞ্চিতে পৌঁছে যায় বাড়তে-বাড়তে। আরশিতে আর ধরে না।

এ মুখ কার ?

গুপি মোক্তারের ?

পাগল নাকি ? বোধ হয় কোনো সাধু-সন্নিসীর। চুলেতে দাড়িতে গোঁফেতে কিম্ভূতকিমাকার।

'হ্যাঁ' বোজার পর গুপি মোক্তারের মনে হল, সাধু হয়ে গেলেও মন্দ হত না। পিসি হয়তো একটু কাঁদবে, তারপর ভুলেও যাবে।

সত্যি, মানুষই তো সাধু হয়।

ভাবলেন, কিন্তু সাধু হতে হলে কী করতে হয় জানা নেই বলেই সাধু হওয়া হয় না। শুধু দাড়ি-গোঁফ আরও বাড়তে থাকে। হাড়-চামড়া আরও শুকোতে থাকে।

সাধু হননি, তবু হঠাৎ একদিন একটা বুড়ো লোক হুম্ করে পথের মাঝখানে একটা পেন্নাম ঠুকে বলে ওঠে, "বাবাঠাকুর গো, আমার ছাগলটা হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে, একটু মন্তর পড়ে দাও বাবাঠাকুর।"

ছাগলটা পাগল হয়ে গেছে !

গুপি মোক্তার ইহজীবনে এমন কথা শুনেছেন কখনো ?

তাই বলে না উঠে পারেন না, "কে পাগল হয়ে গেছে ? তোমার ছাগলটা, না তুমি নিজে ?"

বুড়ো এতে লজ্জা পায় না, হাউমাউ করে বলে, "তা সে একপ্রেকার তাই। আমার বড় আদরের ছাগল, বাবাঠাকুর, কতদিন থেকে পালতেছি। কাল রাতেও বেশ ছেলো, সকালে উঠে দেখি, মাথা চালতেছে, আর পা ঠুকছে। ভয়ে ভয়ে বেঁদে রেখিছি, তা যেন খুঁটি উপড়ে ছুটে পাইলে যেতে চাইছে। চলো না বাবাঠাকুর, একটু মন্তর-টন্তর পড়ে দাও।"

হতভম্ব গুপি বলে ওঠেন, "আমি মন্তর পড়ব? আমি মন্তরের কী জানি?"

বুড়ো এতে টলবে না কি?

সে হঠাৎ মাটিতে হুমড়ে পড়ে দু'হাতে গুপির পা জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "ছলনা করলি চলবেনি বাবা, তোমায় আমি দেখেই চিনিছি। সাধুসন্ত লোক। তোমরা কী না জানো? একটা ফুঁ দিয়েও রোগ-ব্যামো সাইরে দিতে পারো। চলো বাবাঠাকুর, গরিবের কুড়েয় একবার পায়ের ধুলো দেবে চলো। আর ছাগলটারে—"

এ তো ভাল জ্বালা!

গুপি মোক্তার রেগে বলেন, "বলছি আমি মন্তর-ফন্তর জানি না—"

কিন্তু কে শোনে সে-কথা!

বুড়ো নাছোড়বান্দা, "মন্তর যদি খরচা নাও করেন তো পাগল-হয়ে-যাওয়া ছাগলটার মাথায় একটু চরণধূলি দিতে চলুন। আর এই অভাগার ঘরে আজকের দিনটা একটু-সেবা লাগান।"

সেবা! সেবা মানে? ওঃ!

কথাটা শুনে হঠাৎ কানটা জুড়িয়ে যায় গুপি মোক্তারের।

'সেবা' মানে তো ভোজন।

মানে সাধু-সন্নিসীর ভোজন। তার মানে চর্ব্যচোষ্য আহার।

গোরু-ছাগল ইত্যাদি পালে যখন, তখন অন্তত দুধ-ক্ষীর-দই-ছানা তো দেবেই।

গুপি মনের আহ্লাদ চেপে গম্ভীর মুখে বলেন, "বেশ চলো দেখি, কী হয়েছে তোমার ছাগলের।"

ঝোপঝাড় ভেঙে, সরু সরু পথ ধরে খানিকটা হেঁটে গিয়ে দেখেন, গনগনে রোদে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে আর সেটা ব্যা ব্যা করে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে।

গুপি মোক্তার বলে ওঠেন, "এত রোদে বেঁধে রেখেছ কেন ওকে?"

"আজ্ঞে বাবাঠাকুর, কেষ্টর আমার কাল থেকে জোর সর্দি, তাই ওকে রোদে বেঁধে রেখিছি। ...রোদেই তো খেলে বেড়ায়।"

"খেলে বেড়ায়, সে আলাদা, বেঁধে রেখেছ কী বলে? যাও একটু জল নিয়ে এসো চটপট—"

ছুটে গিয়ে এক কলসি জল নিয়ে আসে বুড়ো।

গুপি মোক্তার তা' থেকে খানিকটা খানিকটা করে জল নিয়ে নিয়ে বুড়োর সাধের কেষ্টর মাথায় ছিটিয়ে-ছিটিয়ে দেন, আর কলসি থেকে ঢেলে-ঢেলে খেতেও দেন একটু।

চিৎকার থামান কেষ্টবাবু।

"যাও, বাঁধন খুলে ঘাসটাস খেতে দাও।"

বুড়ো গদ্‌গদ গলায় বলে, "কেষ্ট আমার ঘাস খেতে ভালবাসে না ঠাকুর, দুধভাত খায়।"

"তবে তাই দাও।"

এখন বুড়োর বুড়ি বেরিয়ে এসে গুপি মোক্তারের পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম করে, তারপর বড় এক বাটি দুধ-ভাত নিয়ে এসে কেষ্টর মুখে ধরে। কেষ্ট এক মিনিটে সেটা সাবার করে।

বুড়ো এক গাল হেসে বলে, "তবে নাকি মন্তর জানো না বাবাঠাকুর? আমার সঙ্গে চালাকি করতেছিলে? এখন একটু সেবা হোক আজ্ঞে।"

তা' সেবা ভালই হল।

বাটি-ভর্তি ক্ষীর, পাথরের খোরা-ভর্তি দই, চিঁড়ে, মুড়কি, মর্তমান কলা, আর কাঁচাগোল্লা সন্দেশ। কতকাল এসব জিনিস, খাওয়া তো দূরের কথা, চোখেও দেখেননি গুপি মোক্তার।

খেয়ে-দেয়ে, এখন যেন ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে।

"যা খাওয়ালে বাবা, একটু তো শুতে হয়।" বললেন গুপি মোক্তার।

বুড়ো তাড়াতাড়ি একখানা চৌকি খালি করে দিয়ে একটা কম্বল বিছিয়ে দেয়। শুয়ে পড়েন গুপি।

এদিকে ট্যাঁপা আর মদনা হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

"গুপি মোক্তার হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল বল দিকি?"

"তাই তো ভাবছি। কূলে এসে তরী ডুবল। এতদিন চোখে চোখে রাখছি।"

"ইস্, আরও আগেই ধরে ফেললে হত।"

"আচ্ছা কোন দিকে যেতে পারে?"

"তাই তো ভাবছি রে—"

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দুই বন্ধুতে সম্পূর্ণ অন্য দিকে চলে যায়। খিদেয় পেটের মধ্যে ইঞ্জিন চলছে।

এদিকটায় বেশ লোকালয়, দু-একটা পাকা বাড়িও রয়েছে। মদনা বলল, "এই বাড়িটায় ঢুকে পড়ে কিছু খেতে চাইলে কেমন হয়?"

"ধরে ঠ্যাঙানি দেবে।"

"আহা, অতিথি নারায়ণ না?"

"আমাদের দেখে নারায়ণ মনে হচ্ছে না কি?"

মদনা বলে, "বলেই ছাখা যাক না, মারতে এলে পালাব।"

টঁ্যাপা বলে, "চল্ তবে, খিদেয় তো পেটের মধ্যে শেয়াল ডাকছে।"

"তাহলে যা থাকে কপালে, অঁ্যা।"···মদনা দু'হাত জোড় করে চোখ বুজে বলে, "জয় মা কালী কলকাত্তাওয়ালী।"

তারপর এগিয়ে যায় ওই বাড়িটার দিকে।

গ্রামের বাড়ি-টাড়িতে বাইরের দরজা—মানে সদর দরজা—কলকাতা শহরের মত সব সময় বন্ধ থাকে না, তাই কড়া নেড়ে ডাকাও যায় না।

বাড়ির বাইরে একটা বেড়ার দরজা, সহজেই সেটা ঠেলে ঢুকে পড়া যায়, ঢুকে পড়লে—একটা মেটে উঠোন, তার ধারে-ধারে সারি দিয়ে অনেক গাঁদা গাছ, তুলসী গাছ।

মদনা সাহস করে আগে ঢুকে পড়ে গলা খুলে ডাক দেয়, "বাড়িতে কে আছেন?"

টঁ্যাপা গলা নামিয়ে বলে, "মদনা, যা করছিস, নিজের দায়িত্বে করছিস, তা' মনে রাখিস, আমি কিন্তু বেগতিক দেখলেই টেনে লম্বা দেবো।"

মদনা ভারী মুখে বলে, "দিস! তারপর কিন্তু বলিসনি, মদনা, যা পেয়েছিস ভাগ দে।"

ট্যাপা শুনে রেগে আগুন হয়ে বলে, "আমি অমন হ্যাংলা নই। যা পাবি একাই খাস।"

মদনা আরও ভারী মুখে বলে, "তা তো বলবিই, মনে জানছিস এখন খেতে পাবার মধ্যে পাব পিটনচণ্ডী, তাই একা খেতে বলছিস, কেমন?"

এ কথায় টঁ্যাপা আরো রেগে গিয়ে কী যেন বলতে গিয়েই থমকে তাকায়।

তারপরই হঠাৎ মদনার কাঁধটা খিমচে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে, "মদনা!"

মদনা এর কারণটা বুঝতে না-পেরে বাড়িটার এদিক-ওদিক তাকায়, হঠাৎ চোখ পড়ে দোতলার ঘরের সামনের জানালায়। সঙ্গে সঙ্গে সেও 'টঁ্যাপা' বলে আরও আর্তনাদ করে হঠাৎ উল্টোমুখো হয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে থাকে।...দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছে, দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই।

দুজনের মুখে একই শব্দ—ভূ-ভূ-ভূ।

ছুটতে ছুটতে ঘাম ছুটে যায়, খালি পেট কুঁকড়ে গিয়ে মোচড় শুরু করে, পা টনটনিয়ে ওঠে, তবু ছুটছে। কিন্তু এ তো আর খেলার মাঠের দৌড়-রেসের মত সুখের ছোটা নয়, এ হচ্ছে কাঁটাবন বাঁশবন এড়িয়ে বিচ্ছিরি রাস্তায় ছোটা।...তার ওপর আবার সারাক্ষণ

মনে হচ্ছে, পিছনে কে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে ধরবার জন্যে।

কিন্তু উল্টোদিক থেকে যে আরও একজন, মুখে ওই একই শব্দ করতে করতে এদিকে ছুটে আসছিল, তা তো জানত না এরা, পড়বি তো পড় একেবারে তার ওপর।

তারপর?

তারপর তিনজনে মিলে এ ওকে আঁকড়ে ধরে তালগোল পাকিয়ে মাঠের মাঝখানে গড়াগড়ি। তিনজনেরই মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, আর আওয়াজ উঠছে—ভূ-ভূ-ভূ!

৫

সাড়াহীন, শব্দহীন, চেতনাহীন এক গভীর অন্ধকারের জগতে কতদিন বা কতক্ষণ যে তলিয়ে পড়ে ছিলেন গজপতি উকিল, কে জানে।...

সাড় ছিল না, চৈতন্য ছিল না।

আস্তে আস্তে যেন অলৌকিক ধরনের একটা চেতনা এল। টের পেলেন—ভীষণ, ভয়ঙ্কর, অসম্ভব, অস্বাভাবিক একটা ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে রয়েছেন তিনি।

কেন? কেন? কেন?

কোথায় এই ঠাণ্ডার রাজ্য?

গজপতি কি নদীর জলের তলায় রয়েছেন?

নাকি শীতল জলের কুয়োর মধ্যে?

অথবা কি ফ্রিজের মধ্যে?

না, কোনো কোল্ড স্টোরেজে?

কিন্তু তাই বা কেন? তিনি কি আলু? নাকি মাছ? যে

কোল্ড স্টোরেজে থাকতে যাবেন? তিনি না গজপতি উকিল?

তবে তাঁকে আম-কলার মতো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হবে কেন? অথবা কোল্ড স্টোরেজে? অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন।

হতভম্ব গজপতি কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভেবে কূল পান না।

কিন্তু গজপতি হচ্ছেন উকিল।

শুধু হতভম্ব হয়ে পড়ে থাকবার পাত্র তো আর নন। আর কথাতেই আছে, স্বভাব যায় না ম'লে।

কাজেই এই অলৌকিক-অলৌকিক হাড়-হিম-হয়ে-যাওয়া অবস্থাতেও তিনি জেরা করতে শুরু করলেন।

কিন্তু কাকে? কাকে আর, নিজেকেই। নিজে ছাড়া আছে কে সামনে? অবশ্য জেরাটা মনে মনেই চলে। যথা—গজপতি, তুমি এখন কোথায়?···কী, চুপ কেন? বলো না হে, তুমি এখন রয়েছ কোথায়? ওঃ, কোথায় রয়েছ বুঝতে পারছ না? আচ্ছা ওটা না হয় থাক এখন, এ-কথাটার উত্তর দাও তো বাপু, তুমি বেঁচে আছ কি বেঁচে নেই?

কী? মনে হচ্ছে বেঁচে নেই? আচ্ছা তাহলে বলো তো শুনি, শেষ কবে পর্যন্ত তুমি বেঁচে ছিলে?···মনে পড়ছে না? ভাবো, ভাবো, স্মৃতিশক্তির ওপর হাতুড়ি মেরে-মেরে মনে পড়াতে চেষ্টা করো।

চেষ্টা করছ?

মনে পড়ছে, হঠাৎ একটা বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গিয়েই তোমার এই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। নইলে তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিলে। দাবা খেলছিলে গুপি মোক্তারের সঙ্গে।

পিসির ধমক খেয়ে গুপি মোক্তার সুড়সুড় করে চলে যাবার পর কী করলে তুমি?···হুঁ, আস্তে আস্তে মনে পড়ছে, কেমন? চলে

যাবার পর তুমি তোমার সেই থাক থাক নোটের গোছা গোছাতে বসলে।

তারপর আলমারি খুলে তোমার মক্কেলের নথিপত্র-টত্র গোছালে, একটা দরকারি কাগজ খুঁজে পাচ্ছিলে না বলে অনেক হাঁটকালে, আর সেই সময় সেই কাঠ-পিঁপড়েটা—'টা' না 'গুলো'?

একটায় কি অতটা করতে পারে?

আচ্ছা—ঘরের মধ্যে কাঠ-পিঁপড়ে এল কোথা থেকে?

গজপতি উকিল কি তাঁর ঘরের মধ্যে রসগোল্লার হাঁড়ি বসিয়ে রাখে? না কি বালিশের তলায় ল্যাবেনচুষ রেখে দেয়?

শুকনো খটখটে ঘর।

চিনির গুঁড়োটি পর্যন্ত থাকে না। ঝামেলার ভয়ে দু'বেলা দু' গেলাস চা—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব তো মনে পড়ছে। শুধু কাঠ-পিঁপড়ে নিয়েই অনুসন্ধান করছিলে, কেমন? তা' সে যাক—

তারপর কী হল?

তারপর? তারপরই তো সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তাই না? তবু—তারপর? তারপর? আরে গলায় হাত বুলোচ্ছ কেন? গলায় দাগ পড়ে আছে না কি? মরে গিয়ে সগ্‌গে চলে এসেও পৃথিবীর দাগ-টাগ থাকে?···তা, তাই তো দেখছি। কিন্তু ···সগ্‌গেই যদি এসে থাকো, তো এত হিম কেন? সগ্‌গে কি হিম-প্রবাহ বয়? নাকি রাজ্যটাই বরফের?···তবে আবার লোকে সগ্‌গে যাবার জন্যে এত হ্যাংলামি করে কেন হে?···হুঁ হুঁ, করে বই কী। করে! চিরকাল তো শুনে আসছি, "দান করো, ধ্যান করো, পুণ্য-কাজ করো, হ্যানো করো ত্যানো করো, সগ্‌গে যাবে!"

এই সেই-সগ্‌গের ছিরি?

ও গজপতি, নাকি এটা আর কিছু? গজপতি, তাহলে তাই। এটা বোধহয় নরক। নরকেই এসেছ তুমি।···

কী বলছ? নরকে আসতে যাবে কী দুঃখে? কবে কী পাপ করেছ?···তা পাপ কি আর কিছুই করোনি হে? এই যে আদালতে গিয়ে যত চোর-ডাকাত-খুনে-গুণ্ডাদের পক্ষ হয়ে তাদের জিতিয়ে দিয়েছ···আরে, রেগে উঠছ কেন? কী বলছ? সেই জেতানটাই তোমার পেশা?···পাঁচ-সাত বছর ধরে ল পড়ে-পড়ে ওই বিদ্যেটাই শিখেছ?···তা' অবশ্য ঠিক।···তাছাড়া—শুধুই যে দোষীদের পক্ষ হয়ে লড়েছ তা'ও তো নয়, অনেক বিনা দোষে সাজা পাওয়া নির্দোষকেও বাঁচিয়েছ। কাজেই কাটাকাটি হয়ে গেল।···

কিন্তু বাপু, নরকে যে এসে পড়েছ তাতেও তো ভুল নেই। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারছ?···তোমার ধারে পাশে পায়ে মাথায় রাশি রাশি মড়া! হ্যাঁ হে, মড়া! মাংসের দোকানের বরফ-আলমারির মধ্যে যেমন ছাল-ছাড়ানো ছাগল-ভেড়াগুলোকে থাক দিয়ে-দিয়ে সাজিয়ে রাখে, তোমাকে এবং তোমার চারধারের রাশি রাশি মড়াকে সেইভাবে বরফ-পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে গুঁজে রেখে দিয়েছে।···এর নামই নরক। এরপর হয়তো একটা-একটা করে তুলে নিয়ে গিয়ে গরম তেলের কড়াইতে চুবোবে।···পড়োনি ছেলেবেলায়—

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরো পাতকীর মুণ্ড!'

উকিল গজপতি আবার তখনি বলে ওঠেন, কী হে! কথাটায় তোমার যেন খুব আপত্তি হচ্ছে মনে হচ্ছে?···'পাতকী' শুনে রাগ হচ্ছে?

কী বলছ? তুমি পাতকী হতে যাবে কী দুঃখে? দোষের মধ্যে সারা জীবন কিপটেমি করে করে, না খেয়ে না দেয়ে টাকা জমিয়েছ, স্ত্রী-পুত্রকে ভাল করে খেতে পরতে দাওনি, আর নিজের জমানো টাকা নিজেই লুকিয়ে-লুকিয়ে রেখেছ! এক জায়গায় রেখে স্বস্তি পাওনি, সেখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় লুকিয়েছ; শুধু এই! অর্থাৎ, 'এটা এমন কিছু পাতক নয়? এটুকুর জন্যে নরকে নিয়ে আসা যমদূতেদের উচিত হয়নি?

তা ওহে মরে-যাওয়া গজপতি, বলেছ তুমি ঠিকই। এটা এমন কিছু পাপই নয় যে, তার জন্যে তোমায় নরকে ঠেলে দেবে।··· আমার মনে হচ্ছে, যমদূত ব্যাটাদের ভুলই হয়েছে। কাকে আনতে কাকে এনেছে।···

তবে?

তবে তুমি পালাও হে গজু!

আমি গজপতি উকিল, তোমায় সাহস দিচ্ছি, পালাও এখান থেকে। আমি সঙ্গে থাকলাম।

বরফ-কুণ্ড থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন গজপতি। আস্তে, নিঃশব্দে। চারিদিকের মৃতদেহগুলোর দিকে চোখ পড়বার ভয়ে প্রায় চোখ বুজেই বরফের দেওয়াল হাতড়ে-হাতড়ে কেমন করে যেন সেই ঠাণ্ডা কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাপ্‌স! যমদূত ব্যাটাদের কী কাণ্ড! একটা পুণ্যাত্মা লোককে কিনা স্বর্গের বদলে নরকে এনে ঠেলে দিয়েছে!

যাক এখন বেরিয়ে পড়া গেছে!

এইবার স্বর্গের সিঁড়িটা খুঁজে বার করতে পারলেই হল!

ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প মনে পড়ে গেল। কেমন করে একটা পাপী বামুন আর একটা পুণ্যাত্মা চাষীর জায়গা বদল হয়ে গিয়েছিল যমদূতেদের ভুলে।···স্বর্গে যাবার লোকটা নরকে চালান হয়ে গিয়েছিল, আর নরকে যাবারটা স্বর্গে। শেষে কত কষ্টে ওই চাষীটা স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজে পেয়ে সো—জা উঠে গিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে হাজির। তারপর নারায়ণের সেই যমদূতেদের কী বকাবকি! চাকরি যায়-যায়, শেষে ওই পুণ্যাত্মা চাষীটার দয়াতেই তাদের চাকরি বজায় থাকল।

ঠাকুমা বলেছিল, "ভ্যাখ গজু, শুধু ভালমানুষ হলেই চলে না, লড়তে শিখতে হয়। যেখানে ভুল কি অন্যায় দেখবি, লড়ে যাবি। ভ্যাখ, ওই চাষীটা যদি ভালমানুষি করে ভাবত, আমায় যখন নরকে এনেছে, তখন নরকেই পড়ে থাকি, তাহলে কি তার বৈকুণ্ঠ-বাস হত ?"

আর সেই পাপী বামুনটা ?

সে তো স্বর্গে আসা মাত্রই ধরা পড়ে গেছে। তাকে সো—জা নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গজপতি উকিল এখন ঠাকুমার উপদেশ মনে রেখে স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলেন।···ক্রমশ শীতের অনুভূতিটা কমতে থাকে।

নরক-কুণ্ডের ভিতরটায় তবু কেমন যেন একটা হালকা-হালকা ছায়া-ছায়া আলো ছিল, কিন্তু ওর থেকে বেরিয়ে এসে যেখানে পড়লেন গজপতি, সেখানটা ঘোর অন্ধকার।···তার মানে এখানে এখন রাত্তির। তা পলায়ন দেবার পক্ষে সুবিধের সময়। তবু অন্ধকারে চোখ ঠিকরে ঠিকরে যেতে যেতে গজপতির মনে হল

যেন লম্বা একটা করিডরের মত জায়গায় এসে পড়েছেন তিনি। তার দু'পাশে টানা দেওয়াল, সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা প্রহরী। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে ঢুলছে।

কে জানে এরাই নরকের প্রহরী কিনা !

নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে সেই করিডরটা শেষ হতেই সত্যিই একটা সিঁড়ি দেখতে পেলেন গজপতি।

কিন্তু এটা তো ওঠবার নয়, নামবার। ওঠবার সিঁড়িটা কোথায় ?

দেখা যাক সেটা কোনদিকে।

গজপতি ঠিক করলেন, স্বর্গে উঠে গিয়ে উপর থেকে একবার অবলোকন করবেন দেশের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, মেয়ে, জামাই, ভাই, ভাজ এরা সব কে কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে।

গজপতির খবরটা কি তারা পেয়েছে ?

পেলে কোন্ খবর পেয়েছে ?

নাকি আদৌ কোনো খবর পায়নি ?

কোথা থেকে পাবে ? কে আমার দেশের বাড়ির ঠিকানা জানে ?···ভেবেও গজপতি হিসেব করলেন, খবর নিশ্চয়ই পেয়েছে। কথাতেই আছে 'মন্দ খবর বাতাসের আগায় ছোটে।'

যাক্, দেখি তো গিয়ে। যদি দেখি আমার অভাবে ওরা খুব কাতর, তাহলে ওদের কাছে যে করেই হোক আমার লুকনো টাকাকড়ির সন্ধানটা পৌঁছে দেবো।

দৈববাণী তো হয়, অপদৈববাণীই বা হবে না কেন ? স্বর্গ থেকেই বাণী পাঠাব। নয়তো নিজে একবার নেমে এসেও বলতে পারি। শুনেছি তো মৃত্যুর পর ভৌতিক দেহটা যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে।···আর, আর···আর যদি দেখি, আমার জন্যে কারুর

কিছু এসে যায়নি, খাচ্ছে দাচ্ছে হাসছে ঘুমোচ্ছে, তাহলে সব টাকাকড়ি কোনো সাধুর কাছে অশরীরীভাবে গিয়েও পৌঁছে দেবো।

ভাবার পর আবার সিঁড়ির জন্যে হাতড়াতে লাগলেন গজপতি। অথবা তাঁর আত্মা। স্বর্গে উঠে গিয়েই তাঁর বোড়ো গ্রামের বাড়ির দিকে তাকাবেন। ঠিকানাটা একবার মনে মনে আউড়ে নিলেন। গ্রাম—বোড়ো, পোঃ অঃ—বোড়ো, জিলা—বর্ধমান।

গজপতি সিঁড়ির ধাপে পা দিলেন

কিন্তু ওঠার সিঁড়ি কোথা? সেই তো নামার সিঁড়ি, স্বর্গে তো আর নেমে যাওয়া যায় না, উঠেই যেতে হয়। গজপতি একটু দাঁড়িয়ে থেকে বুঝলেন তিনি স্রেফ্ নেমে এসেছেন। আর এসেছেন মর্তে। এই সব রাস্তা তাঁর চেনা। হ্যাঁ, সবই চেনা-চেনা। নিঃঝুম রাত্তিরের রাস্তা বটে, চারিদিকের দোকান-পসারও বন্ধ, তবু চিনতে ভুল হয় না। এটা কলকাতা···রাস্তায়-রাস্তায় আলো।

হঠাৎ চমকে উঠলেন গজপতি।

এ কী!

কী সর্বনাশ!

আরে ছি ছি! এই অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন তিনি?

এ রকম হবার মানে?

'মানে'টা ভাবতে বসার আগে গজপতি দিশেহারা হয়ে চারিদিকে তাকালেন।···কোথায় কী!···গজপতি পাগলের মত বড় রাস্তা

থেকে পালিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আর সেখানেই পেলেন মুশকিল আসানের উপায়।···

একটা একতলা বাড়ির ছাদ থেকে একখানা ধুতি ঝুলছে। বোধহয় ঠাকুর-চাকর কারো ধুতি। শুকোতে দিয়েছিল, রাত্রে তুলতে ভুলে গেছে।···

গজপতি মনে মনে বললেন, কে বলে ভগবান নেই? আছেন, আছেন, দারুণভাবে আছেন! শুধু মানুষের জন্যেই নয়, আছেন মরে-ভূত-হয়ে-যাওয়াদের জন্যেও। তা নইলে এমন সুবিধে হয়?

ধুতির ঝুলন্ত কোণটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলেন গজপতি! উপরের কোণটা বোধহয় ছাদে কোনো তারে বাঁধা ছিল, কোণটা ছিঁড়ে—গজপতির হাতে নেমে এল।

হোক কোণ ছেঁড়া, হোক ময়লা চিরকুট্টি, গজপতি এখন এক-খানা গামছা পেলেও বর্তে যেতেন, আর এ তো জলজ্যান্ত একখানা ধুতি।

ধুতিটাকে বাগিয়ে পরে নিয়ে গজপতি এখন 'মানে'টা বুঝতে চেষ্টা করলেন।···বোঝা গেছে! মরার পর তো তাকে চিতায় তুলেছিল? সেই সময় কাপড়জামা সব ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। উঃ, ভাগ্যিস এখন রাত্তির! দিনের বেলা হলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হত!

কিন্তু আমায় কি কেউ দেখতে পাবে?

গজপতি ভাবলেন, এখন তো আমি ভূত হয়ে গেছি। ভূতদের কি দেখতে পাওয়া যায়? ঠিক বুঝতে পারলেন না, দারুণ ঘুম পাচ্ছিল, একটা দোকানের ধারের কাঠের সিঁড়িতে ঘাড় গুঁজে বসে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ একটা 'হঠ্‌হঠ্‌' শব্দে। দোকানটা যে খুলতে এসেছে, সে তাড়া দিচ্ছে, 'হঠ্‌ হঠ্‌!'···রাগে মাথা প্রায় জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা আনন্দ বোধ করলেন। হঠ্‌ হঠ্‌ করছে! তার মানে লোকটা গজপতিকে দেখতে পাচ্ছে।··· তার মানে তিনি এখনো পুরোপুরি ভূত হয়ে যাননি, হাফ ভূত হয়ে রয়েছেন। তার মানে, ভাগ্যি রক্ষে যে, কাল ধুতিখানা পাওয়া গিয়েছিল।

দিনের আলোয় তাকিয়ে দেখলেন নিজের দিকে। এখন আমায় হঠ্‌ বলবে না তো কি 'আপনি মশাই' বলবে? মান্য-টান্য যা কিছু তো জামাকাপড়কেই।···তাহলে এখন সব-আগে দরকার ভাল জামা-কাপড়। অর্থাৎ চটপট বাড়ি ফেরা।

গজপতি রাস্তার চারদিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এটা কলেজ স্ট্রীট। ভবানীপুরে আমার সেই কমলা ভবনের তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে যেতে হলে বাসে চেপে বসতে হবে। কিন্তু বাস-ভাড়া কোথায়? চোখে যখন দেখতে পাচ্ছে আমায়, তখন কি আর ভূত বলে রেয়াত করবে? কণ্ডাক্টার মশাই ঠিক ভাড়া চেয়ে বসবে।···না হলে 'ভাগো ভাগো' করে নামিয়ে দেবে।

আচ্ছা আমি কি সত্যিই ৺ হয়ে গেছি?

নিজের গায়ে নিজে চিমটি কাটলেন গজপতি, খুব জোরে। উঃ করে উঠলেন।

তাহলে?

চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবার পর কি সাড় থাকে? তার মানে আমি সত্যি মরিনি।

গজপতি একটা বাড়ির রোয়াকে বসে পড়ে আকাশ-পাতাল

ভেবে ভেবে সেদিনের সব কথা মনে আনতে চেষ্টা করলেন।...মনেও পড়ল।...শুধু 'সেইদিন'টি যে কতদিন তা বুঝতে পারলেন না। তবে সেই দিনগুলো যে কোথায় কাটিয়ে এলেন, তা অনুমান করতে পারলেন।...

অনেক দিন আগে 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' নামের একটা সিনেমা দেখেছিলেন গজপতি, এক বন্ধুর পয়সায়। নিজের পয়সায় সিনেমা দেখবেন এমন পাগল তো নন তিনি। যাই হোক, সেই ছবিটার কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, তাঁকে নিয়েও একটা ছবি করা যায়। 'যমালয়-ফেরত জ্যান্ত মানুষ'। পয়সা হতে পারে তাতে। কিন্তু সে তো পরের কথা—এখন যে ট্যাঁক গড়ের মাঠ। উপায়?

উপায় আর কী হাঁটা মারা ছাড়া?

শরীর তো ভেঙে পড়তে চাইছে, খিদে তেষ্টাও কম নয়, তবু হাঁটতেই শুরু করেন গজপতি উকিল। ভিখিরির মত দেখতে লাগছে বলেই তো আর ভিখিরির মত ভিক্ষে চাইতে পারেন না?

গজপতির হঠাৎ একটু হাসি এল।

আমার টাকায় ছাতা ধরছে, অথচ আমি বাস-ভাড়ার ক'টা পয়সার জন্যে চার-পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটতে যাচ্ছি। যাক—বাসায় গিয়ে পড়লে সবই পাওয়া যাবে। কিন্তু ফ্ল্যাটের চাবি? সেই ষোলটা চাবির তোড়া? সেটা কোথায়?

বরাবর তো কোমরে ঘুন্‌শির সঙ্গে বাঁধা থাকে, কই সেটা? কোমরে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ল, সেও তো ঘুচে গেছে। এখন একমাত্র উপায় ফ্ল্যাটবাড়ির যে কেয়ার টেকার আছে, তার কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নিয়ে—

হাঁটতে হাঁটতেই ভাবছিলেন গজপতি, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ

থামলেন।···আচ্ছা, প্রথমে গুপি মোক্তারের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠে, ওর একটা ফর্সা জামা-কাপড় পরে, কোন-না কিছু খেয়ে টেয়ে, আর নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে, খানিকটা হাসাহাসি করে নিয়ে, তারপর দুজনে মিলে কেয়ার টেকারের কাছে হানা দিলে কেমন হয়?···ঠিক তাই দেওয়া যাবে।

গজপতি ভাবলেন, শুনেছি—জ্যান্ত মানুষের মৃত্যুসংবাদ রটলে, তার নাকি পরমায়ু বাড়ে। গজপতিরও তাহলে পরমায়ু বাড়বে। ভেবে ভারী আহ্লাদ হল গজপতির। আরও অনেক দিন বাঁচলে, আরও অনেক টাকা জমাতে পারবেন।

হাঁটতে হাঁটতে ভবানীপুরে চলে এলেন গজপতি।

কলকাতা শহরে কেউ কারো দিকে তাকিয়ে দেখে না। কেউ লক্ষও করল না উকিল গজপতি খালি গায়ে একখানা ময়লা ধুতি পরে রাস্তা হাঁটছে তো রাস্তা হাঁটছে।

পাড়ার মোড়ে ঢুকেই আহ্লাদে প্রাণ নেচে উঠল। আঃ, সেই পুরনো চেনা দৃশ্য। রাস্তার তিন মাথার মোড়ে পাড়ার ছেলের দল ইঁট পেতে ক্রিকেট খেলছে।

আগে অবশ্য মনে মনে ওদের গালমন্দ করতেন গজপতি এবং মুখে খুব গম্ভীরভাবে বলতেন, রাস্তাটা খেলবার জায়গা নয় হে! লোকের চলবার জায়গা।

আজ কিন্তু একগাল হেসে বলে ওঠেন, "কী হে, বেশ জোর খেলা চালিয়েছ যে!"

বলাটা শেষ করতে হল না, ছেলেরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই "উরে ব্বাস" বলে চোঁ-চোঁ দৌড়। কেউ ব্যাট হাতে, কেউ ব্যাট ফেলে। দৌড়ের ধাক্কায় সাজানো ইটগুলো মাটিতে গড়াগড়ি।

ব্যাটারা আমায় দেখে ভয় পেয়েছে।

বলে গজপতি একটু হেসে মোড়ের পানের দোকানের সামনে গিয়ে বলে ওঠেন, "কী হে, চিনতে পারছ? নাকি ভূত বলে ভয়ে ছুট দেবে?"

বলতে যা দেরি।

পানওলা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পান সাজার সাজ-সরঞ্জাম উল্টে ফেলে, তার উঁচু দোকানটা থেকে নেমে পড়ে ছুট্ ছুট্!

ছুটতে ছুটতে তার কাছা খুলে যায়, সেই কাছায় পা আটকে হুড়ুম করে রাস্তায় আছাড়ও খায়, তবু আবার উঠে পড়ে গায়ের ধুলো না ঝেড়েই ছুট মারে।

এ তো বড় মুশকিল হল। ভাবলেন গজপতি, এই রোদেভরা দিনের বেলায় জলজ্যান্ত একটা লোককে সবাই ভূতই বা ভাবছে কী বলে? হাড় চামড়া রক্তমাংস, এই সব থাকে ভূতের?

কিন্তু রাগ করলে আর কী হবে?

পাড়ায় যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সে-ই 'ও বাবা' 'উরে ব্বাস' 'কে? কে?' বলে দৌড় মারছে।

আরে বাবা, এ-বুদ্ধি নেই, ভূতই যদি হয়, তার কাছ থেকে পার পাবি তুই দৌড় মেরে? দাঁড়িয়ে কথাটা শোন্!

চেষ্টা অনেক করলেন।

যাদের-যাদের সঙ্গে বিশেষ চেনা, যেমন, পাড়ার স্টেশনারি

দোকান 'বিজয়া ভাণ্ডার'-এর কর্তা সুবোধবাবু, 'মাধব লণ্ডি'র কর্মচারী খগেন, মুদির দোকানের মালিক গগন, ভুজাওয়ালা ঝগড়ুলাল, তাদের সকলের সঙ্গেই দেখা করতে গেলেন। সবাই পিটটান দিল। মুখে সেই বাণী 'কে? কে? কে?'

তারপর সেই একই ব্যবহার, ছুট ছুট ছুট।

তার মানে, সাধারণ বুদ্ধি কারো নেই। 'কমলা ভবন'-এর বাড়িওয়ালারই কি থাকবে? তাহলে ওদিকে যাবেনই বা কী করে?

অবশেষে গজপতি ঠিক করলেন, যেমন করে হোক দেশের বাড়িতে চলে যাই। নিজের লোকেরা তো আর ভূত বলে ছুট মারবে না?

কিন্তু যাওয়া কী করে যায়?

যেতে হলে তো পয়সা লাগবে?

নিজের লুকনো সেই থাক থাক নোটের গোছার চেহারা স্মরণ করে গজপতির বুক ফেটে কান্না এসে যাচ্ছিল। উঃ! কী মতিচ্ছন্নই হয়েছিল সেদিন!

নাঃ! মতিচ্ছন্নই বা কী? সবই ভাগ্যচক্র।

যাক, এখন দরকার একটা ফর্সা জামা-কাপড়, আর কিছু টাকা-পয়সা। অবশ্য টাকা-পয়সাটাই আসল, ওটা হলে সবই হবে। শুধু জামা-কাপড় কেন, ছাতা, জুতো সবই হতে পারে।

কিন্তু চুরি আর ভিক্ষে, এ ছাড়া নিঃসম্বল লোকের চট করে টাকা-পয়সা হয় কী করে? অথচ—ওটা তো করতে পারবেন না। বড় জোর করতে পারেন চালাকি। তা সেটাই করতে হবে।

পরদিন সকালে হঠাৎ কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরের ধারে

চাতালে এক জ্যোতিষীকে বসতে দেখা গেল। পরনে ময়লা ধুতি, কপাল ভর্তি সিঁদুর মাখা, সামনে কয়লা দিয়ে আঁকা রাশিচক্র। গম্ভীরভাবে সেই দাগগুলোর ওপর দাগা বুলোচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কী সব বলছে।

ব্যস! খদ্দেরের অভাব হয় না।

মন্দিরে যাওয়া-আসার পথে একবার করে বসে পড়ছে অনেকেই। বিশ্বাস থাক না থাক, কৌতূহল।

তা' জ্যোতিষীটা বোকা নয়।

এক-একটি প্রশ্নের উত্তরের দাম পাঁচ নয়া পয়সা।

"বলুন তো বাবা, আমার সময়টা এখন কেমন যাচ্ছে?"

উত্তর, "খুব খারাপ নয়, একটু গোলমেলে যাচ্ছে।"

জ্যোতিষী মনে মনে বলেন, সময় 'খুব' খারাপ হলে, তুমি কি আর এমন ধোপ-দুরস্ত সাজ করে রাস্তায় বেরিয়েছ?

আর একজনের প্রশ্ন, "একটা বিপদে পড়েছি, কী করে উদ্ধার পাব বলতে পারেন?"

জ্যোতিষী বলেন, "পয়সা কড়ি খরচ করলেই হবে।"

মনে মনে বলেন, যে বিপদই হোক, উদ্ধার হতে পয়সা টাকা লাগবেই। অসুখ-বিসুখ, মামলা-মকদ্দমা, ভুল-ভ্রান্তি, যা-কিছুই সারাতে যাও, টাকা চাই।

কথায়-কথায় পয়সা আসছে।

টাকা-পয়সা জমে যায় ঝপাঝপ।

এর ওপর আবার 'স্পেশাল গণনা' মামলা মকদ্দমা। ওঁর কাছে বিশদ বললেই উনি পরামর্শ দেন। দেবেন না কেন, উকিল মানুষ, ওই কাজই তো করে এসেছেন চিরকাল।

এতে লোকে লাইন দিয়ে ভিড় করছে।

'মামলা মকদ্দমার ফলাফল বলিয়া দেওয়া হয়। **স্পেশাল** গণনা। স্পেশাল কেসের গণনায় ফী বেশি।'

কাজেই কিছু দিনের মধ্যেই জামা কাপড় জুতো চিরুনি কেনবার এবং শুধু রেলভাড়ার মত টাকা কেন, যথেষ্টই টাকা জমে যায়। খাওয়া-দাওয়ায় তো বেশী খরচা করেননি। কৃপণ মানুষ, করেনও না কখনো। একা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন, নেহাত মক্কেলরা আসবে বলে।

রাতারাতি হঠাৎ একদিন জ্যোতিষীর পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম হাওয়া। সকালে লোক এসে অবাক। কয়লার দাগগুলো পড়ে আছে, কপাল-ভর্তি সিঁদুরমাখা লোকটির চিহ্ন নেই। তিনি ততক্ষণে নাপিতের কাছে চুল-টুল ছেঁটে, দাড়িফাড়ি কামিয়ে, নতুন জামা-কাপড়-জুতো পরে, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বর্ধমানে যাবার টিকিট কাটছেন।

বর্ধমানে নেমে, খানিকটা সাইকেল রিকশায়, আর খানিকটা হেঁটে, তবে বোড়ো গ্রামে পৌছতে হয়।

৬

এখন দেখা যাক্ গজপতির সেই বোড়ো গ্রামের বাড়িতে কী অবস্থায় আছে বাড়ির লোক। তা অবস্থা খুব খারাপ। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ বাড়ির 'কর্তা' লোকটি নিহত হয়ে বসলে কি আর অবস্থা সুখের হয়? ওদেরও হয়নি। গজপতির অবিকল গজপতি-সদৃশ ভাই গণপতি, ছেলে ভবপতি, মেয়ে গন্ধেশ্বরী, জামাই বটুক, আর গিন্নী জগদ্দলবাসিনী, সবাই মুষড়ে পড়ে আছে। তাছাড়া খবরটা তো পেয়েছিল নেহাতই লোকের মুখে।

খবরটা বেরিয়েছিল খবরের কাগজে।

তবে গ্রামে তো আর ঘর-ঘর খবরের কাগজ আসে না! এই বোড়ো গ্রামে দু' কপি 'দৈনিক বার্তাবহ' আসে, এক কপি পতিত-পাবনী প্রাইমারী স্কুলের হেড্ মাস্টার মশাইয়ের নামে, আর এক কপি আসে বড় মুদির দোকানের মালিক নিতাই মণ্ডলের নামে।

তা নিতাই মণ্ডল প্রায় আকাশবাণীর মত কাজ করে, গ্রামসুদ্ধ লোককে খবর শোনায়। অনেকেরই ঘরে-ঘরে অবশ্য ট্র্যানজিসটার

আছে, তা থেকে অন্য খবর শোনে, কিন্তু 'ঘটনা ও দুর্ঘটনা'?

সে খবরের সাপ্লায়ার তো ওই খবরের কাগজ।

সেদিন কাগজে দুর্ঘটনার খবরের হেডিংয়ে হঠাৎ গজপতি উকিলের নাম দেখে নিতাই শিউরে, চমকে, হেঁচে, কেসে, বিষম খেয়ে একাকার। এ কোন্ গজপতি উকিল?

অনেকের সঙ্গে গজপতির ভাই গণপতিও সকালবেলা কেরোসিনের বোতল হাতে করে খবর শুনতে এসেছিল। শোনার পর কেরোসিনটা নিয়ে চলে যাবে।

বুড়ো নিতাই মণ্ডল তার দিকে তাকিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "গণ, এই খবরটা একবার নিজে পড় তো?"

গ্রামে অমন মুদি, চাষী সবাই বয়েসে ছোট হলে বাবুদের 'তুমি-তুমি' করে, নামও ধরে।

গণপতির দিকে কাগজখানা বাড়িয়ে ধরতেই অন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। যারা পড়তে জানে না তারাও।

গণপতি কাগজটায় চোখ বুলিয়ে আরও কাঁপা গলায় বলে উঠল, "নিতাইকা, কেরোসিনের বোতলটা ধরো, আমার মাথা ঘুরছে।"

তারপর সেখানে প্রশ্নের ঢেউ।

কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

ব্যাপার এই। "দিনেদুপুরে জনৈক উকিল নিহত।···আততায়ীরা তাঁহার গলায় গামছা বাঁধিয়া হত্যা করিয়া পলাতক। খুব সম্ভব অর্থের জন্যই এই হত্যা। উকিল ভদ্রলোক বিশেষ কৃপণ ছিলেন বলিয়া খ্যাত। পুলিস তাঁহার কমলা-ভবনস্থিত তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের ঘর হইতে দরজা ভাঙিয়া মৃতদেহ বাহির করে।···প্রকাশ, তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকিতেন, বিকালবেলা কোনো এক চায়ের

দোকানের বয় তাহার জন্য চা লইয়া আসিত, সেদিনও আসিয়াছিল, কিন্তু দরজায় টোকা দেওয়া সত্ত্বেও দোর খোলা না পাইয়া এবং ঘরের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া ভয়ে ভয়ে ওই ভবনের কেয়ার-টেকারকে জানায়, কেয়ার-টেকার পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখে লোহার আলমারি খোলা, বিছানা তচ্‌নচ্‌, উকিল গজপতি সাহা মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন। আলমারিতে টাকাকড়ির চিহ্নমাত্র নাই। গজপতি সাহার পরিবারবর্গ তাঁহার দেশের বাড়িতে থাকিতেন বলিয়া প্রকাশ, পরিচিত কেহই তাঁহার দেশের বাড়ির ঠিকানা বলিতে পারে নাই। পুলিস তাঁহার মৃতদেহ মর্গে পাঠাইয়া দিয়াছে।"

এরপর আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

গণপতি কেরোসিনের বোতল ফেলে রেখেই বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে তুমুল কান্না ওঠে। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ে সাহা-বাড়িতে। তিনদিন তিনরাত বাড়িতে রান্না-খাওয়া বন্ধ থাকে। থাকবেই তো, এই ঘটনা জানার পর কার আর খেতে ইচ্ছে হয়?

কিন্তু ক্রমে আবার অবস্থা শান্ত হয়। শ্রাদ্ধ শান্তি চোকে। বিধবা হয়ে যাওয়া জগদ্দলবাসিনী ছেলেকে বলে, "ভব, তুই একবার কলকাতার সেই বাসাটা খোঁজ করে আয় দিকি, যদি কোনো লেখা-পত্তর থাকে।"

ন্যাড়া-হওয়া ভবপতি গম্ভীরভাবে বলে, "আমি ছেলেমানুষ, আমায় হয়তো ঢুকতেই দেবে না, কাকা যাক।"

জগদ্দলবাসিনী রেগে বলে, "ঢুকতে দেবে না মানে? মালিক কে?···কাকা যাবে না। ও চিরকালের উদোসাদা। হয়তো চোখের সামনের জিনিসও দেখতে পাবে না। তোর বাপের স্বভাব তো

জানতিস ? নোটের গোছা যেখানে-সেখানে লুকিয়ে রাখত ! হয়তো খুনেরা সব খুঁজে পায়নি। আছে কোথাও। পঁচিশ বছর বয়েস হল তোর, ছেলেমানুষ কী ?”

লজ্জা পেয়ে ভবপতি একদিন তোড়জোড় করে কলকাতায় চলে যায়, বাবার ফ্ল্যাটের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বারও করে, কিন্তু টাকা-কড়ি কিছু নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে শুধু তার অভিযানের রিপোর্টটি।

গজপতির ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি, কেয়ার-টেকার ভবপতিকে হুট আউট করে দিয়েছে। বলেছে, “তুমি যে তেনার ছেলে তার প্রমাণ কী ?” ভবপতি চেঁচামেচি লাগিয়েছিল, তাই শুনে পাশের ঘর থেকে এক জাঁদরেল মহিলা বেরিয়ে এসে ভবপতিকে যাচ্ছেতাই করেছেন। বলেছেন, “তুমি যদি বাছা সত্যিই গজ উকিলের ছেলে হও তো বলি, তোমার বাপ নিজে খুন হয়ে, আমাকেও খুন করে গেছে। আমার সোনার ছেলে গুপি বন্ধুর শোকে সেই অবধি নিরুদ্দেশ।···সে আমার দুধের বালক, জগতের কিছুই জানে না, কোথায় খাচ্ছে, কোথায় থাকছে, ভগবান জানেন ; তুমি বাছা যাও দিকিন। তোমায় দেখে আমার রাগে দুঃখে মাথা জ্বালা করছে।··· তোমার বাপের টাকা-ফাকা কিছু পাচ্ছ না, সব চোরে নিয়ে গেছে।”

এরপর আর ভবপতি ফিরে না এসে কী করবে ?

জগদ্দলবাসিনী রেগে বলে, “তোকে না পাঠিয়ে আমারই যাওয়া উচিত ছিল দেখছি। দেখতাম সেই গিন্নীটি কেমন।”

কিন্তু এখন আর কী হবে ?

তেরো নম্বর ফ্ল্যাট চাবিবন্ধ হয়ে পড়েই থাকে, আর গজপতির

বাড়ির লোকেরা পড়ে থাকে সেই দেশের বাড়িতেই।

এখন যদি কেউ পুলিসকে ধরে প্রমাণ-ট্রমান দেখিয়ে বাড়ির ভাড়া মিটিয়ে মালপত্তর নিয়ে যায় তো যাক। বাড়িওলার আপত্তি নেই।

কিন্তু কীই বা মালপত্তর আছে কিপটে গজপতির? যত সব টুটা-ফুটা বাসন-কাপড়। থাকার মধ্যে একটা দেড়ফুট পুরু গদি। এই একটাই বিলাসিতা ছিল গজপতির, পুরু গদিতে শোওয়া। কিন্তু সেও কি আর আস্ত? মনে হয় না। কে যাবে সেই তুলো-ছেঁড়া গদিটা আনতে? আনতে যা খরচা হবে, তাতে তো একটা নতুন গদি হয়ে যেতে পারে। কাজেই কেউ যায়নি।

শুধু জগদ্দলবাসিনী এক একদিন মনের দুঃখে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদে। এমনি একদিন বিকেলবেলা বসে বসে চক্ষু বুজে কাঁদছে। হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলে উঠল, "আর কান্নাকাটি করে কাজ নেই জগদ্দল, আমি এসে গেছি।"

কে বলল?

কোথা থেকে বলল? কার গলা?

ভব-র বাপের না?

জগদ্দলবাসিনী হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে চোখ খুলে দেখে, সামনে সেই চিরপরিচিত মূর্তি।

যে লোকটা নাকি কতদিন যেন হয়ে গেল খুন হয়ে গেছে! জগদ্দলবাসিনী মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে চেঁচায়, ভূ-ভূ-ভূ!

সামনের ছায়ামূর্তি দুঃখের গলায় বলে, "জগদ্দল, তুমিও আমায়

ভূত ভাবলে? তাকিয়ে দেখো, চিনতে পারো কিনা।"

কিন্তু কে তাকাচ্ছে?

জগদ্দলবাসিনী চোখ বুজে হাতজোড় করে বলে, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও। তোমায় দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে।"

সামনের মূর্তি তখন রেগে ভেঙিয়ে বলে ওঠে, "আর এই যে এতক্ষণ কান্না হচ্ছিল—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—একবার দেখা দাও গো—"

জগদ্দল আরও কাতর হয়ে বলে, "আর কক্ষনো বলব না গো! এই নাক মলছি, কান মলছি, বল তো নাকে খত দিই।"

গজপতি কড়া গলায় বলে, "থাক্, আর অত-য় কাজ নেই। গনা কোথায়? ভবা কোথায়?"

তা কোথায়, সেটা আর বলতে হয় না, জগদ্দলবাসিনীর কান্নার চোটে কোন্ ঘর থেকে যেন বেরিয়ে এসে গণপতি হঠাৎ সামনে ওই মূর্তি দেখেই একেবারে সপাটে শুয়ে পড়ে মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে বলে ওঠে, "দোহাই দাদা, তুমি আর এ-বাড়িতে দিষ্টি দিতে এসো না। দেখো, মাত্তর তিন মিনিটের বড় হলেও, আমি চিরকাল তোমায় 'দাদা' বলে এসেছি, ভক্তিমান্য করেছি, সেই ছোট ভাই বলে খ্যামাঘেন্না করে আমাদের রেহাই দিয়ে চলে যাও।"

গজপতির মূর্তি প্রাণপণ চেষ্টায় ওদের বোঝাতে চেষ্টা করে, সে ভূত নয়, বর্তমান, কিন্তু ওরা কেন বুঝবে? কেনই বা একটা ভূতের আবদার রাখতে যাবে?

গণপতি এখন বলে ওঠে, "ভবা, এইখানে সামনে একটা আঁশ-চুপড়ি রাখ তো। শুনেছি, ওনারা পাহাড় ডিঙোতে পারে, আঁশ-চুপড়ি ডিঙোতে পারে না।"

এদিকে গণপতির বৌ চেঁচাতে থাকে, "ওগো, কেউ একটা রোজা ডেকে আনো না গো, চারদিকে সর্ষেপড়া ছড়িয়ে দিক। নইলে যে বটঠাকুরের ভূত ঘরে উঠে পড়বে।"

তবু অনেকক্ষণ চলে এই টাগ্ অফ্ ওয়ার।…গজপতির 'প্রেতাত্মা'ও বলতে ছাড়ছে না, "আরে বাবা আমি মরিনি, চিমটি কেটে দেখো।"

এরাও তত রোজা রোজা করে হাঁপায়।

বলতে-বলতে এসেও পড়ে ভূতের রোজা পঞ্চু খাঁড়া। এসে আর কথাবার্তা নেই, উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা গজপতির প্রেতাত্মার সামনে বড় এক সরা গন্ধক জ্বেলে দেয়। গন্ধকের ধোঁয়ায় বাড়ির লোকেরা সরে সরে দাঁড়ায়।…

পঞ্চু তখন একটা বিছুটি গাছের ডাল জলে ভিজিয়ে গজপতির প্রেতাত্মার দিকে আছড়ে আছড়ে জোর মন্তর পড়তে থাকে, "লাগ্

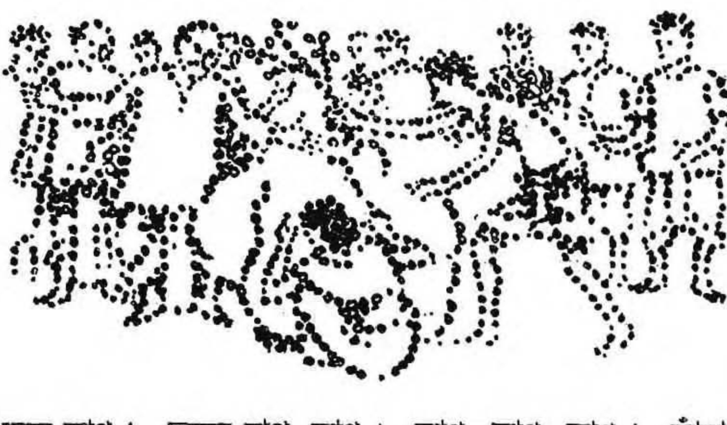

মন্তর লাগ্! ভূতের বাপ ভাগ্। ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্! আঁদাড় পাঁদাড় পেরিয়ে শ্যাওড়া গাছ ডিঙিয়ে, বাঁশবন, বাদাবন, কচুবন,

ঘেঁচুবন, কাঁটাবন, বিছুটি বন, চৌষটি বন ছাড়িয়ে ভাগ্ !"

জল-বিছুটির ডালটাকে নিয়ে আস্ফালনই করছিল, হঠাৎ সেটা প্রেতাত্মার গায়ে লাগতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, "পঞ্চা, ভাল হবে না বলছি। তোকে আমি জল-বিছুটি মেরে শায়েস্তা করব বলে রাখছি।"

এ-কথায় গণপতির বৌ ডুকরে কেঁদে উঠে ওই গন্ধকের সরায় আরো খানিক গন্ধক ছুঁড়ে দেয়। ধোঁয়ায় ঘুরঘুট্টি হয়ে ওঠে চারদিক। আর ততক্ষণে তো প্রায় সন্ধেও হয়ে এসেছে। ওই গন্ধক-জ্বলার আলোতেই যা চারিদিকের মানুষগুলোকে ছায়া ছায়া ভূত ভূত দেখাচ্ছে। সবগুলোই যেন প্রেতাত্মা।

পাড়ার লোক যারা ভূত ঝাড়ানো দেখতে এসেছে, তারা নীরবে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, কথা যা বলছে বাড়ির লোক। জগদ্দল-বাসিনী কেঁদে কেঁদে বলছে, "ওগো তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও না গো! কেন মিথ্যে দাঁড়িয়ে জল-বিছুটি খাবে? কক্ষনো একটা মশার কামড় সহ্য করতে পারো না। ও পঞ্চু, একটু আস্তে আস্তে মারো বাবা!"

পঞ্চু এখন মহোৎসাহে একটা মশাল জ্বেলে বাড়ির চারিদিকে সর্ষেপড়া দিচ্ছিল, গজপতি-গিন্নীর কথায় মশালটা নাচিয়ে বলে, "আস্তে কী গো মাঠান্! ইনি যে নড়তেছেন না। অপঘাতের মিত্যু তো! একেবারে রামভূত হয়ে রয়েছেন। সহজ মড়ার ভূত হলে ওই গন্ধকের ধোঁয়াতেই পগার পার হয়ে যেত।" বলেই আবার মশালটা নাচাতে-নাচাতে মন্তর আওড়ায়, "যাঃ যাঃ যাঃ। যেখেনে তোর গ্যাঁত-কুটুম সেইখেনে যাঃ। গোভূত, মামদো ভূত, পেঁচোয় পাওয়া যারা—তোর কুটুম তারা। তাদের কাছে যা।

তাদের সঙ্গে পাত পেতে গন্ধগোকুল খা।"

গজপতির প্রেতাত্মা আকাশ ফাটিয়ে বলে, "পঞ্চা, বিদেয় হ' বলছি—নইলে তোকে আমি দেখে নেব। আচ্ছা—"

পঞ্চু খ্যা খ্যা করে হেসে বলে, "তুই আমায় কী দেখবি? আমার সব্ব শরীলে ভূতবন্ধন। লেঃ লেঃ লেঃ।"

হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তির শব্দ! তারপর ভূত মাটিতে পড়ে যায়। আবার একগাদা ধোঁয়া করে পঞ্চু, তারপর মাটিতে পড়া ভূতকে লক্ষ করে সেই জল-বিছুটির ছপটি মারতে থাকে সপাসপ। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ আর্তনাদ ওঠে, "ওরে পঞ্চা রে, কাকে মারছিস? আমি আমি! দেখতে পাচ্ছিস না?"

পঞ্চুর এক হাতে জল-বিছুটি আর এক হাতে মশাল। সেই মশালের আলোয় দেখে নিয়ে খ্যাঁকখেঁকিয়ে বলে, "তা তো জানিই হে, তুমি তুমি তুমি!···তা' বিদেয় হও।"

ধোঁয়ায় চক্ষু অন্ধকার, তবু জোর করে আশপাশের ভিড় ঠেলে উঠোন থেকে দালানে উঠে এসে গজপতির যমজ ভাই গণপতি চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "যে বিদেয় হবার হয়েছে রে পঞ্চা, আমায় ঠেলে উঠোনে ফেলে দিয়ে দাদার ভূত ভেগেছে। আর তুই আমাকে ···ওরে ভবা, জল আন্, চোখে দিই। চোখ জ্বলে গেল। ব্যাটা পঞ্চা, পাজী লক্ষ্মীছাড়া, মোক্ষম মারটা কিনা আমায় মারলি?"

ভূত বিদায় হয়েছে শুনে এখন সবাই এগিয়ে আসে। ততক্ষণে হ্যারিকেন জ্বলে, কুপি জ্বলে। পাড়ার কেউ কেউ পকেট থেকে টর্চ বার করে জ্বালে, দেখা যায়, বেচারা গণপতির সারা গায়ে দাগড়া-দাগড়া, চোখ লাল টকটকে।

গণপতি ডুকরে ডুকরে বলে, "তিন মিনিটের বড় দাদাকেও

আমি 'দাদা' বলে মান্য করে এসেছি চিরকাল, এই তার পুরস্কার ? জল-বিছুটির মুখে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে সট্‌কান দিল ?"

এখন মজা-দেখা লোকেরা আর কিছু দেখবার নেই দেখে হতা হয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে গেল।···আর তারপর ভেবেচিন্তে ভবপতি বলে উঠল, "আচ্ছা কাকা, যে হাতটা তোমায় ঠেলে ফেলে দিল, সে হাতে হাড়-মাংস ছিল ?"

হাড় মাংস !

গণপতি চমকে বলে, "তা' তো ছিল। ছিল বলে ছিল ! সাঁড়াশির মতন আঙুলে আমার কাঁধটা একেবারে খিমচে ধরে—"

"তবে ? ওনাদের কি হাড় মাংস থাকে।"

গণপতি অন্যমনা গলায় বলে, "তা তো থাকে না শুনেছি।"

জগদ্দলবাসিনী বলে ওঠে, "তবে কি ও সত্যি মরেনি ?"

শুনে গণপতি জোর গলায় বলে, "তাও কখনো হয় ? কাগজে লিখেছিল না—'পুলিস মৃতদেহ মর্গে পাঠাইয়া দিয়াছে।'—আসলে ওনারা ইচ্ছে করলে দেহ ধারণ করতে পারেন। তাই করেছে আর কি দাদা।"

রোজার ব্যাপারে, আর বাড়ির লোকের ব্যাভারে রাগে জ্বলে-পুড়ে উঠোনে নিজের জায়গায় যমজ ভাই গণপতিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, জ্বলতে জ্বলতেই উঠোনের পিছনের বাগান দিয়ে বেরিয়ে এলেন গজপতি।

উঃ, কী অসহ্য !

নিজের বাড়ির লোকও মরা লোককে ফিরে আসতে দেখে আহ্লাদে দু-বাহু তুলে নাচার বদলে স্রেফ ভূত বলে রোজা দিয়ে

জলবিছুটি লাগাতে এল। সর্ষেপড়া দিল। গন্ধকের ধোঁয়ায় চোখের বারোটা বাজিয়ে দিল।

জগদ্দলবাসিনী না হয় বোকাসোকা, ভবা না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু গনা? আমার তিন মিনিটের ছোটভাই গণপতি? তারও বুদ্ধি হরে গেল? এমনিতে তো ধুরন্ধর, আর এর বেলায় হুশ হল না, ভূতের গায়ে হাড়মাংস থাকে না?

খেয়াল হল না, ভূত অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্কাতর্কি করে না? ন্যাকাচণ্ডী না কি?

আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি।

ভূত বলেই যখন ধরেছ, আর মন্তর ঝেড়ে মেরে তাড়িয়েছ তখন ভূতুড়ে উৎপাত করেই তোমাদের জীবন মহানিশা করে ছাড়ছি। আর ওই ব্যাটা পঞ্চা ঠগ জোচ্চোর, ভাওতাবাজ, পাজী, ছুঁচো ইঁদুর আরশোলা মশামাছি ছারপোকা কাঠপিপড়ে, তুই যদি সত্যি রোজা হতিস, ভূত কি মানুষ বুঝতে পারতিস না?

তার মানে সত্যি রোজা নয়।

লোক ঠকিয়ে বেড়ায়।

ওকে আমি শুধু জল-বিছুটি নয়, জল-বিছুটির সঙ্গে আঝাড়া বাঁশের গোড়া দিয়ে পেটাব।

আবার কিনা মন্তর পড়া হচ্ছে!

রোসো, তোমার হয়েছে কী!

অনেক বাকি আছে।

গটগট করে চলতে চলতে একটু থমকে দাঁড়ালেন গজপতি।… সামনের ওই মাঠটায় ওটা কী জন্তু?…ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্না উঠেছে, বোধহয় চতুর্থী কি ষষ্ঠীর চাঁদের, তাতেই আবছা দেখা যাচ্ছে,

মাঠে কেমন যেন একটা বৃহৎ জানোয়ার নড়ানড়ি করছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কী ও? বুনো মানুষ? সার্কাস পার্টি থেকে পালানো হাতি? ওর কি কোনো অসুখ করেছে, তাই মাটিতে পড়ে ছটফট করছে?

কাছে যেতে ভয় করছে, অথচ কৌতূহলও প্রবল। যদি সার্কাস-পালানো হাতি হয়, খবর দিতে পারলে বাহাদুরি। আর যদি মোষও হয়, মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে যখন, তখন কি আর লাফিয়ে উঠে শিং দিয়ে পেট চিরে দিতে আসবে?

গুটি-গুটি এগিয়ে গেলেন। কেমন একটা 'বু বু' শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলেন তিন-তিনটে মানুষ পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বু বু করছে। কেউ কাউকে ছাড়ছে না।

কে এই তিনজন?

তা দুজনের হিসেব গজপতির জানা না হলেও আমাদের জানা। ট্যাপা আর মদনা।···সেই বড়সড় দোতলা বাড়িটায় খাওয়া জুটবে কিনা সন্ধান করতে গিয়ে, দোতলার জানলায় একটি মুখ দেখে 'ভূ ভূ' করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে-আসতে আর-একজন তেমনি জোরে ছুটে আসা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গিয়েছে। যে আসছিল তার মুখেও ওই একই শব্দ—'ভূ ভূ'।

ভয়ে কেউ কাউকে ছাড়ছে না, আঁকড়ে ধরে বসে আছে, অথচ আবার ছাড়াবার জন্যেও লড়ালড়ি করছে, তাই এই গড়াগড়ি কাণ্ড!

কিন্তু এই আর-একজনটি কে?

আবার কে?

আমাদের গুপি মোক্তার। যাঁর জন্যে ট্যাঁপা আর মদনা এত দুঃখবরণ করে মরছে। আহা! স্বপ্নেও কি ভেবেছিল ওরা, তিনি নিজেই সেই 'ঐতিহাসিক' চটের থলিটি হাতে নিয়ে ওদের হাতে ধরা দেবেন!

ব্যাপার এই—অনেক দিন পরে চাষী-বাড়িতে ভালমত আহারটি করে আর ঘুমিয়ে গুপি বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে পড়ন্তবেলায় যখন ধীরে-ধীরে একটি সরু মেঠো রাস্তা ধরে আসছিলেন, তখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন, ফর্সা ধবধবে কাপড়জামা পরা গজপতি উকিল সেই রাস্তার উল্টোদিক থেকে বেশ গটগটিয়ে আসছেন।

দেখেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল গুপি মোক্তারের। গজপতি উকিল মানে তো আর উকিল নয়, এ হচ্ছে তার প্রেতাত্মা। তবে আর ভয়ে পাগল হয়ে ছুটে পালাবে না মানুষ?

যে যত বুদ্ধিমানই হোক, সেই একই ভুল করে। ভূতের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। অথচ জানে—ভূত তার কঙ্কাল হাতটা বার করে যত ইচ্ছে লম্বা করতে পারে।

জানলেও, ওই মানুষের স্বভাব।

ছুটতে-ছুটতে কাঁটাগাছে গা ছড়েছে, বাঁশবন পার হতে বাঁশপাতায় চোখমুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তারপর হুড়মুড়িয়ে ওই ছেলে দুটোর ঘাড়ে এসে পড়েছেন।

গজপতি একটুক্ষণ এদের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে দেখে বলে ওঠেন, "হাতিও নয়, মোষও নয়, এ তো দেখছি মানুষ, এখানে হচ্ছেটা কী?"

যেই না বলা, ওরা ছটফটিয়ে তিড়বিড়িয়ে তিনজনে একত্রে কুমড়ো-গড়গড়ি দিতে থাকে। পালাত, কিন্তু পালাবে কী, ট্যাঁপার জামার বোতামের সঙ্গে মদনার লম্বা চুলের গোছা আটকে গেছে, আর

গুপি মোক্তারের ধুতি ছিঁড়ে গিয়ে সেই ফুটোর মধ্যে মদনার পা ঢুকে গেছে, ছাড়াতে পারছে না।

সেই অবস্থাতেই গুপি মোক্তার কাতরভাবে বলে ওঠেন, "হেই গজপতি, তুমি আমার ওপর নেকনজর দিও না ভাই! দাবা খেলায় তুমি বরাবর আমার কাছে হেরেছ সত্যি, তাই বলে ভূত হয়ে আমার ঘাড়ে চাপতে আসবে?"

বললেন একেবারে বম্বেমেল চালিয়ে।

শুনে গজপতি থমকে বলেন, "কে? কার গলা? গুপি, তুমি এভাবে এখানে? ব্যাপার কী?"

ভূতের গলা? এত পরিষ্কার?

খোনা নয়, কিছু নয়, কী হল?

তবু গুপি আর্তনাদ করেন, "গজপতি, তু-তুমি আমায় ভয় দেখাতে এসেছ?"

গজপতি রেগে উঠে বলেন, "আমি তোমায় ভয় দেখাতে এসেছি? আগে থেকেই তো তোমরা তিন তিনটে বীরপুরুষ—কিসের ভয়ে কে জানে—কুমড়ো-গড়াগড়ি খাচ্ছিলে। মানেটা কী? এ দুটো কে?"

বলে বিশালকায় গজপতি ল্যাংবেঙে টিকটিকির মত ছেলে দুটোকে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে টেনে তোলেন। আর তারপর কড়া গলায় বলে ওঠেন, "চেনা বলে মনে হচ্ছে! পকেটে দেশলাই আছে নিশ্চয়, জ্বালা শিগগির!"

আগুনের সঙ্গে ভূতের চিরকালের বিরোধ, আগুন দেখলেই ওরা পালায়, অথচ এ ভূত নিজেই দেশলাই জ্বালতে বলছে? তাহলে? তাছাড়া এ যখন বজ্রমুষ্টিতে তাদের তুলে ধরল, সে হাত

ঠাণ্ডাও নয়, অশরীরীও নয়।

ফশ করে একটা দেশলাইকাঠি জ্বেলে দেখে নিয়েই ট্যাপা বলে উঠল, "উ-উকিলবাবু, আ-আপনি তাহলে মরেননি ?"

উকিলবাবু এদের চেনা।

ছু-ছুবার গজপতির সামনে কোর্টে গিয়ে জরিমানা দিয়ে এসেছে পকেট মারার অপরাধে।

গজপতি ওদের একবার দেখে নিয়ে ঠাট্টার গলায় বলেন, "না হে, মরে উঠতে পারলাম না। যমের অরুচি তো, সে-ব্যাটা আমায় ধরে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল।···সে-কথা যাক, তোমরা মানিকজোড় ছুটি এখানে এসে জুটলে কী করে? মোক্তারের সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রে নাকি ?"

এতগুলো স্বাভাবিক কথা বলার পর ওদের আর যেন তেমন সন্দেহ থাকে না। গুপি মোক্তার তাই বলে ওঠেন, "দোহাই ভাই, ও-কথা বোলো না। এই মানিকজোড়কে আমি জীবনেও চিনি না। তুমি হঠাৎ খুন হয়ে যাওয়ায় মন-মেজাজ কেমন হয়ে গিয়ে পিসিমার হাতের আনন্দনাড়ুগুলো পর্যন্ত ফেলে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম নিরুদ্দেশ হবো বলে। কেন জানি না, এই ছোকরা ছুটো তদবধি আমার পিছনে লেগে আছে। তবে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে তা জানতাম না। আমি হতভাগা না-খেয়ে না-দেয়ে ঘুরে ঘুরে মরছি, তার সঙ্গে ওরাও যে কেন! পিসির চর নাকি হে ?"

কথার মাঝখানে গজপতি বলে ওঠেন, "কিন্তু তুমিই বা কেমন বল তো হে? আমি খুন হওয়ায় আমার ছেলে-বৌ-ভাই-ভাইপো দিব্যি রইল, আর তুমি কিনা না খেয়ে-দেয়ে—এত ভালবাস তুমি আমায় ?"

গুপি মোক্তার হতাশ গলায় বলে, "তুমি ভূত কি ভগবান এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই, তোমার কাছে বানানো কথা বলব না, বাড়ি থেকে কেটে পড়েছিলাম ভয়ে। থাকলে তো ওই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে যেতে আসতে হতো ?···আর আমার হারানো গামছাখানার জন্যে পুলিসের জেরার মুখে পড়তে হতো, তাই !"

হারানো গামছা ! পুলিসের জেরা !

গজপতি বলেন, তুমি যে আমায় ক্রমশ রহস্য-রোমাঞ্চর গাড্ডায় ফেলে দিচ্ছ হে গুপি ! তা এভাবে তো দাঁড়িয়ে শোনা যাবে না, চল কোথাও গিয়ে বসিগে।"

কিন্তু ট্যাপা আর মদনা ততক্ষণে একসঙ্গে বলে উঠেছে, "আহাহা মোক্তারমশাই, আপনি নাকি কথা বানাবেন না ? বলি খুনটা করেছিল কে ?"

ওদের কথা শুনে গজপতি হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠেন, "খুনটা তো কেউই করেনি রে ব্যাটা, জলজ্যান্ত বেঁচেই যখন রয়েছি।"

আরও হাসতে থাকেন হা হা হা।

যেমন বিশাল চেহারা গজপতির, হাসিও তেমনি বিশাল। খোলা মাঠে রাত্তিরের আকাশের নীচে ভৌতিক হাসি বলেই মনে হয়।

আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে এদের।

অনেক দূর থেকে সে হাসি শুনতে পাওয়া যায়, সাহাবাড়িতে গিয়েও পৌঁছয়। বাড়িসুদ্ধ সবাই চিৎকার করে রামনাম জপ করতে থাকে আর জগদ্দলবাসিনী চমকে চমকে বলে, "ভবা, তুই কালই গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আয়।"

একটু পরে মদনা গুজগুজ করে বলে, "তা সে না হয় আপনি মরণ

নেই বলে বেঁচে গেছেন, হাসপাতালের ডাক্তাররা হয়তো বাঁচিয়েছে। কিন্তু মোক্তার মশাই বলুন, ওনার ওই চটের থলিটিতে কী আছে?"

চটের থলিটিতে কী আছে?

গুপি মোক্তার রেগে আগুন হয়ে বলেন, "ওঃ, এর লোভে তোরা আমার সঙ্গ নিয়েছিলি বুঝি? ভেবেছিস আমিই উকিলবাবুকে মেরে তাঁর টাকাকড়ি নিয়ে সটকান দিয়েছি, কেমন? নে নে—ছাখ কী আছে।"

রাগ করে থলিটা উপুড় করে ঝাড়েন গুপি।

ট্যাপারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে—একখানা ধুতি, একটা জামা, একটা লুঙ্গি, একটা খুদে চিরুনি, একটা টুথব্রাশ, একটুকরো কাপড়কাচা সাবান, একটা ছোট শিশিতে একটু সর্ষের তেল আর কিছু খুচরা পয়সা।

ব্যস! খতম!

চিরুনি আর তেলের শিশি সঙ্গে নিয়ে বেরোননি গুপি, পরে সংগ্রহ করেছেন। জিনিস দেখে ট্যাপা কোম্পানি লজ্জায় লাল। এই? এর জন্যে তারা দু-দুটো ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে ওই বুড়োর পিছনে ছায়ার মত ঘুরে মরছে!

মাথা হেঁট করে বসে থাকে ওরা।

তারপর আবার একটা পোড়োবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে চারজনে মিলে বেশ আসর জমিয়ে বসে। নিজের নিজের বুদ্ধির দোষে কে কেমন দুর্গতি ভোগ করেছে, তার কাহিনীর অবতারণায় মাঝে-মাঝেই খুব হাসির শব্দ ওঠে, তবে বিশালকায় গজপতির বিশাল হাসিটা যেন আকাশে ওঠে। হয়তো বা ইচ্ছে করেই মজা দেখতে এত জোরে হাসিটা ছাড়েন তিনি। তা ওঁর মজা, আর-এক জায়গায়

সাজা। আমবাগান, কাঁঠালবাগান, বাঁশবাগান সব পেরিয়ে সে-হাসি পাড়ার অনেক বাড়িতে গিয়েই পৌঁছয়।···সন্ধেবেলা ওদের রোজা ডাকার ব্যাপার পাড়ার কারও তো আর জানতে বাকি থাকেনি, সকলেই এখন রাত-গভীরে এই আকাশ-ফাটানো 'হাঃ হাঃ হাঃ' হাসির শব্দে নিঃসন্দেহ হয়, এ হাসি স্রেফ ভৌতিক হাসি।

যে যার মাথায় বালিশের তলায় রামনাম লেখা কাগজ রাখে, বাচ্চাদের মাথার কাছে মা-দুর্গার পুজোর ফুল রাখে, ঘুম আসতেই চায় না।

৭

হল কী, এই ব্যাপারে দারুণ বিপদে পড়তে হল গজপতির ভাই গণপতিকে।

গণপতি যেই না সকালে উঠে পুকুর-ধারে গেছে দাঁতন করতে, অমনি ঘাটের সবাই এ ওকে ইশারা করছে, ও একে ইশারা করছে।

সকলের মুখেই একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ।

কে এ? রোজ যে-লোকটা এইভাবে এসে দাঁতন করে, সেই লোক, না অন্য একজনের ভৌতিক দেহ?

যমজ দু' ভাইয়ের চেহারা এমন অবিকল এক যে এর কপালে আঁচিল তো ওর কপালে আঁচিল, এর গলায় জড়ুলের দাগ তো ওর গলায় জড়ুলের দাগ। এ-ও যেমন লম্বা-চওড়া, ও-ও তেমনি লম্বা-চওড়া, কাজেই লোককে দোষ দেওয়া যায় না।

গণপতি কারণ বুঝতে পারে না, দাঁতন করতে করতে হঠাৎ দেখে ঘাট খালি। কী ব্যাপার, সকলেরই আজ এত কাজের তাড়া? তা,

ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না গণপতি ; ভাবে, ভালই হল, পুকুর তোলপাড় করে সাঁতার দিয়ে চানটা করে নেওয়া যাবে।

কিন্তু বিপদ হল নিতাই মুদির দোকানে গুড় কেনার ছুতো করে খবরের কাগজ শুনতে গিয়ে। গণপতি দেখল, যারা সবাই নিতাইকে ঘিরে বসে কাগজ শুনছিল, তারা কী-রকম উশখুশ করতে শুরু করছে, আর নিতাই ঝপ্ করে দোকান থেকে উঠে পড়ে দোকানের পিছন দিকের দরজা দিয়ে ভিতরের গুদাম-ঘরটায় ঢুকে পড়ল।

গণপতি ভেবেছিল, গতকালকের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বিশদ শোনাবে লোককে, তা নয়, সবাই যেন অচেনা-অচেনা মুখ করে সরে পড়ছে।

গণপতি চেঁচিয়ে বলল, "নিতাইকা, গুড় চাই এক কিলো—"

সাড়া নেই নিতাইয়ের।

গণপতি পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে বলে, "ব্যাপার কী হে শ্রীধর ? লোকটার হল কী ?"

শ্রীধর গুজগুজ করে কী যেন বলে গা বাঁচিয়ে সরে বসে।

গণপতি রেগে উঠে বলে, "কী হল তোমাদের ? বাড়িতে প্রেতাত্মার আগমন হয়েছিল বলে কি আমাকেও প্রেতাত্মা ভাবছ নাকি ?"

শ্রীধর থতমত খেয়ে বলে, "না না, মানে ইয়ে আর কী।"

"আশ্চর্য !" বলে রাগ করে চলে যায় গণপতি।

হাটে গিয়ে একজনের হাতে একটা আস্ত কাতলা মাছ দেখে যেই জিজ্ঞেস করেছে—মাছটা কত নিল—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মাছটা আছড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

তার মানে গণপতির অবস্থাও গজপতির কাছাকাছি।

বাড়ির লোকও হঠাৎ-হঠাৎ চমকে-চমকে তাকাচ্ছে।

গণপতি যখন খেতে বসে মাছের কাঁটা চিবোচ্ছে, তখন তার নিজেরই বৌ আড়াল থেকে দেখে ভয়ে কাঁটা মুখ করে মন্তর পড়ছে, "ভূত আমার পুত শাঁকচুন্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন, ভয়টা আমার কী!"

অথচ ভয়ে সে সারাই হচ্ছে।

কারণ দু-একদিন পর থেকেই বাড়িতে দারুণ ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

রাত্তিরে যেই সবাই শুয়েছে, একটু ঘুম ঘুম এসেছে, হঠাৎ জানলায় ঠকঠক শব্দ।...

গণপতি যদি চেঁচিয়ে ওঠে, অমনি 'কে ? কে ?' শুরু হয়ে যায় জগদ্দলবাসিনীর ঘরে।

জগদ্দলবাসিনী যখন 'কে ? কে ?' করে ওঠে, শব্দ চলে যায় ভবপতির ঘরে।...তারপর এক সঙ্গে সব দরজা-জানলায় ঠক ঠক ঠক।

তার সঙ্গে আবার উঠোনে খটাখট ঢিল।

সারারাত সবাই জেগে বসে।

আবার হয়তো পরদিন ভরদুপুরেই, বাড়ির সব লোক নীচের তলায়, হঠাৎ ছাতে দুমদুম শব্দে কারা যেন দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়।

প্রথম দিন জগদ্দলবাসিনী চেঁচামেচি করেছিল, "ছাতে কে রে? কেষ্টা বুঝি? নেবে আয় বলছি। এই রোদে ছাতে?"

কেষ্টা গণপতির ছোট ছেলে, জ্যেঠিকে খুব ভয় করে। কিন্তু দেখা গেল, ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই, দৌড় আরও বাড়ল বরং।

জগদ্দল তেড়ে ছাতে উঠতে গিয়ে দেখে, কেষ্ট তার মায়ের কোলের কাছে বসে চুষে চুষে আমসত্ত্ব খাচ্ছে। জগদ্দলের আর ছাতে যাওয়া হয় না, ভয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। আর কেষ্টার মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "কেষ্টা এইটুকু ছেলে, একা ছাতে অমন রসাতল করতে পারে? আমি আর এই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকছি না, কালই ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।"

কিন্তু বাপের বাড়ি তো পাড়াতেই। সারা পাড়াতেই তো ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা চলছে। বেদম ঢিল পড়ছে, যখন তখন জিনিস উধাও হয়ে যাচ্ছে, বাড়ির আনাচে-কানাচে খোনা গলায় কথা চলছে।

ক্রমশই বাড়ছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছে গণপতি, হঠাৎ একখানা বাখারির মত খটখটে লম্বা হাত বাগানের দিকের জানলা দিয়ে ঢুকে এসে গণপতির মশারি নাচাতে শুরু করেছে।

এতে আর গণপতির চেঁচিয়ে ওঠবারও ক্ষমতা থাকে না, গুলিভরা উঁচোনো রিভলভারের সামনে মানুষ যেমন কাঠের পুতুলের মত

স্থির হয়ে থাকে, তেমনি স্থির হয়ে পড়ে থাকে গণপতি প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে। চোখটা বুজে ফেলবারও ক্ষমতা নেই।

তা এই লম্বা হাত একা গণপতির মশারিকেই নাচাচ্ছে না, পাড়ায় অনেকের মশারিই নাচাচ্ছে। ভয়ে লোকে জানলা-দরজা 'আটে-কাঠে' বন্ধ করে শুচ্ছে, কিন্তু জানলায় যদি দমাদ্দম ঘা পড়ে? কতক্ষণ আর ঠিক থাকবে পাড়াগাঁয়ের পুরনো বাড়ির খিল ছিটকিনিরা?

ভয়ে লোকে ঘরে দপদপিয়ে আলো জ্বেলে রাখছে, কিন্তু রাখলেই বা কী? সরু বাখারির আগায় যখন ইয়া লম্বা লম্বা আঙুলওয়ালা হাতের চেটোখানার ছায়া দেয়ালে কি মশারির চালে পড়ে, তখন কার এত সাধ্য আছে বাবা যে, হাতখানা ধরে ফেলে দেখতে যাবে, এর মূলটা কোথায়!

শুধু পাড়াসুদ্ধু কেন, গ্রামসুদ্ধু লোকই ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। রাতের বেলা বাড়ির বার তো দূরের কথা, ঘরেরই বার হচ্ছে না কেউ। বিকেলবেলাই খেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা-জানলা এঁটে বসে থাকছে।

কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে?

ছাতে দৌড়োদৌড়ির শব্দ নেই?

হঠাৎ-হঠাৎ জিনিসপত্র উড়ে-যাওয়া নেই? রাস্তায় পথে যেখান-সেখান থেকে খোনা-খোনা গলায় দুর্বোধ ভাষায় কথা নেই? উঠোনে, বাগানে, রান্নাঘরের পিছনে অদৃশ্যলোক থেকে হিহি-হাহা হাসি নেই? দিনদুপুরে রাস্তায় হাঁটছে, হঠাৎ কোথা থেকে মড়মড়িয়ে এক গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পায়ের সামনে, রাস্তা আটকে পড়া নেই?

কিন্তু বোড়ো গ্রামের লোকেরা এত সব নীরবে সহ্যই বা করছে কেন? তাদের কি পঞ্চু খাঁড়া নেই? সারা গ্রামটাই তো সে হলুদ-পোড়া ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে সর্ষেপড়া ছড়িয়ে ভূত বন্ধনী করতে পারে!

তা কে জানে পারত কিনা, তবে পঞ্চু খাঁড়া তো আর নেই। না না, মরেটরে যায়নি, শুধু গ্রামছাড়া হয়ে গেছে। এই বোড়ো গ্রাম ছেড়ে একেবারে নবদ্বীপে মামার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। বুড়ো বয়সে মামার বাড়ি কেন? সে-কথা বলতে হলে, সেই সেদিনের কথা বলতে হয়।

পঞ্চু খাঁড়া যেদিন সাহাবাড়িতে ভূত ঝাড়িয়ে এল, তার পরের দিন ভরদুপুরে, গ্রামের শেষপ্রান্তে পঞ্চু খাঁড়ার চালাঘরের সামনে হাঁক পড়ল, "পঞ্চা! পঞ্চা!"

পঞ্চু তখন সবেমাত্র কুঁচো কাঁকড়ার ঝাল আর গুগলি ভাজা দিয়ে একহাঁড়ি পান্তা ভাত মেরে মাদুরটি বিছিয়ে শুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই বজ্রকণ্ঠধ্বনি শুনে ধড়মড়িয়ে বেরিয়ে এল।

এল তো এলই।

মানে, এসে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনে গজপতি!

হাতে একটা কাঁটাগাছের ডাল।

মুখে কড়া হাসি।

একে কি আর প্রেতাত্মা বলে ভ্রম হয়?

পঞ্চু খাঁড়া তেমনি পাথরের মত দাঁড়িয়েই থাকে। পঞ্চুর চোখ ট্যারা হয়ে যায়, মুখ চুন হয়ে যায়, মাথা ভোম্বল হয়ে যায়।

গজপতি কাঁটা-ডালটাকে শূন্যে আছড়াতে আছড়াতে বলেন, "বেরিয়ে আয়, বাইরে বেরিয়ে আয়। দেখি তোর সর্বাঙ্গে কেমন

ভূত-বন্ধন ! আয় বলছি ।”

পঞ্চু হঠাৎ হাতজোড় করে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলে, “দোহাই বাবু, মারবেন না। এই মাত্তর খেয়ে উঠেছি, মার

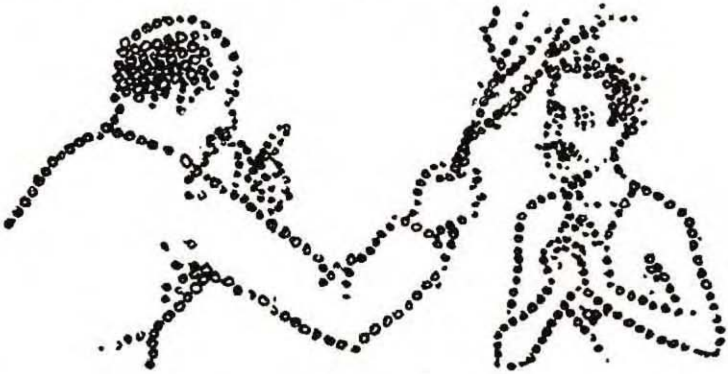

খেয়ে যদি পেটের ভাত ক'টা উঠে আসে, তাহলে আজ্ঞে হুক্কুর শেষ থাকবেনি ।”

গজপতি বলেন, “কেন ? তোমার না সর্ব অঙ্গে ‘ভূত-বন্ধন’ ! মারে তো কিছু হবার নয় ।”

পঞ্চু হঠাৎ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রণাম করে বলে, “ভূত-বন্ধনে ভূতের মার ঠেকানো যায় বাবু, মানুষের মার ঠেকানো যায় না ।”

“হুঁ ! তাহলে আমায় মানুষ বলে স্বীকার করছিস ?”

পঞ্চু হাতজোড় করে গরুড় পক্ষীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলে, “মাপ চাইছি বাবু !”

“শুধু মাপ চাইলে হবে ? তুই কাল গন্ধকের ধোঁয়ায় আমার চোখের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিস, আমার গায়ে জলবিছুটি

মেরেছিস, সে-সব ভুলে যাচ্ছিস ?”

পঞ্চু কাতর গলায় বলে, “মোক্ষম মারটা কিন্তু বাবু আপনার ভেয়ের গায়েই পড়েছে।”

গজপতি মনে-মনে অবশ্য বলেন, ঠিক হয়েছে, পড়াই উচিত, আমায় বলে কিনা, দাদা এ বাড়িতে দিষ্টি দিও না, রেহাই দাও।

তবে মুখে হারবেন কেন ? রেগে রেগে বলেন, “তবে তো আরো চমৎকার। আমার ভাইকে মোক্ষম মার মেরেছ শুনে আমি তোমায় মণ্ডা খাওয়াব, কেমন ? ব্যাটা, তোমার বিদ্যে আমার জানা হয়ে গেছে, তুমি ভূত কি মানুষ চিনতে জানো না, আবার ভূত ঝাড়াতে আসো ?”

“আর আসব না বাবু।”

“না, আসবি না। এখন ছ' মাসের মত গাঁ-ছাড়া হবি, এই আমার সাফ কথা।”

পঞ্চু কাতর হয়ে বলে, “ঘর ছেড়ে কোথায় যাব বাবু ?”

“শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকগে যা। নাকি শ্বশুর তাড়িয়ে দেবে ?”

এত সবের মাঝখানে পঞ্চু খাঁড়া ফিক করে হেসে ফেলে, “মূলে মা ভাত রাঁধে না, তায় তপ্ত আর পান্তো।…বে-ই করিনি, তা শ্বশুরবাড়ি !”

গজপতি একটু থেমে চড়া গলায় বলেন, “তোর বাপ তো বে করেছিল !”

“আ—আজ্ঞে, কী বলতেছেন ?”

“বলছি, তোর বাপ তো বিয়ে করেছিল !”

পঞ্চু আবার হেসে ঘাড় কাত করে বলে, “তা আজ্ঞে করেছেল বই কি।”

"তবে যা, বাপের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাক গে যা।"

বাপের শ্বশুরবাড়ি!

পঞ্চু একটু হতভম্ব হয়ে থেকে বলে, "আজ্ঞে সেটা কী?"

"সেটা কী তা জানিস না ব্যাটা বোম্বেটে ভূত? মামার বাড়ি যাসনি কখনো?"

"ওঃ হো হো। ইশ!"

পঞ্চু অনেকখানি জিভ বার করে ফেলে।

গজপতি আবার কাঁটার ডাল নাচিয়ে বলেন, "মনে থাকে যেন, আজই গাঁ-ছাড়া হতে হবে। নচেৎ আমার পোষা দুই নন্দী-ভৃঙ্গীকে দিয়ে যা করব, দেখবে! তোমার ভূত ছাড়িয়ে ছাড়ব। তখন নাকে খত দিতে দিতে গ্রাম ছাড়তে হবে।

"না বাবু, না, আজই চলছি। অনেকদিন দিদিমাটারে দেখাও হয় নাই, ভালই হল।"

পঞ্চুর ভালই হল।

আর পঞ্চুর দেশ ছাড়ায় গজপতির নন্দী-ভৃঙ্গীরও ভাল হল। তারা যত ইচ্ছে উপদ্রব করে বেড়াতে শুরু করল বোড়ো গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে। এটাই এখন চাকরি তাদের।

এখন আর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে নেই। গজপতি সেটার ভার নিয়েছেন। মাঝে একদিন বর্ধমানে গিয়ে 'বর্ধমান বিনোদ হোটেলে'ও খেয়ে এসেছে আর 'সুখশ্রী' সিনেমা হাউসে সিনেমা দেখে তাজা হয়ে এসেছে। গুপি মোক্তার কলকাতায় চলে গেছেন 'গজপতি উকিলের হত্যা রহস্যে'র কিনারা করতে।

মোক্তার মানুষ, কোর্ট-কাছারি, জজ-ব্যারিস্টার, থানাপুলিশ, এ সব তো তাঁর চেনা-জানা, মুখস্থ। সেদিন বিনা নোটিসে হঠাৎ দাবা

খেলার সঙ্গীটা খুন হয়ে যাওয়ায় মন মাথা কেমন গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল, তাই না এতদিন এত দুর্ভোগ!

এখন যখন দেখলেন বন্ধু জলজ্যান্ত বিরাজিত, তখন আবার পূর্বশক্তি ফিরে পেয়ে সোজা কলকাতায় চলে গেলেন, রহস্যজাল ছিন্ন করতে।

তবে গজপতি যে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, আর তিনি কিপটেমি করে টাকা জমাবেন না, এবং জমানো টাকা-ফাকা সব বন্ধু-বান্ধবদের বিলিয়ে দেবেন, সে-আশ্বাসে মনে মনে হেসেছেন। আর আড়ালে বলেছেন, ওহে গজপতি উকিল, দৈবক্রমে না হয় তুমি মরে বেঁচেছ, তা 'পরমায়ু' থাকলে এমন কেউ-কেউ বাঁচে। জ্বলন্ত চিতা থেকেও ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বাঁচে। কিন্তু তোমার জমানো টাকাগুলি যে বাঁচেনি, সেটি তো আর দেখনি।...পুলিস দেখেছে, এমন কী, স্বয়ং পিসিও দেখেছে তোমার আলমারি দেরাজ হাট করে খোলা, ঘরের জিনিস লণ্ডভণ্ড! টাকা পয়সার চিহ্ন মাত্তর নেই।

মনে দুঃখও হয়েছে। আহা রে, কিপটের টাকা, ওই টাকার শোকেই না শেষে সত্যি মরে, হার্ট ফেল করে। এখন সব আছে ভেবে বুক তাজা।

অথচ এদিকে নন্দী-ভৃঙ্গীকেও টাকার লোভ দেখিয়ে রেখেছেন গজপতি।

"চালিয়ে যা, চালিয়ে যা, যত পারিস ভূতের পার্টের প্লে চালিয়ে যা। মজুরি পাবি।"

তা পার্ট ভালই করছে নন্দী-ভৃঙ্গী।

এখন তো আশপাশের গ্রাম থেকে কেউ আর 'বোড়ো' গ্রামের দিকেও আসছে না। পাড়ায় পাড়ায় রটে গেছে, গ্রামটা ভূতাশ্রিত

হয়ে পড়ে আছে। এমন কী, ডাকসাইটে ভূতের রোজা পঞ্চু খাঁড়াকেও নাকি গায়েব করে ফেলেছে ভূতেরা।

কিন্তু নন্দী-ভৃঙ্গীর নিজেদের মনের মধ্যে এখনও যেন সন্দ-সন্দ ভাব।

সারারাত হুটোপাটি করে এসে ভোরবেলা সেই পোড়োবাড়ির লুকনো ঘরে লতাপাতা জ্বেলে চা বানাতে বসে মদনা ক্লান্ত গলায় বলে, "উকিলবাবুর 'পোরোচনায়' ভূতুড়ে কাণ্ড তো চালিয়ে চলা হচ্ছে মোক্ষম, টাকা পয়সা পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই সন্দ।"

ট্যাপা বলে, "কেন? সন্দ কিসের? এখনই তো দিচ্ছে। ওনার পয়সাতেই তো খাচ্ছি-দাচ্ছি। আমাদের তো আর কেউ ভূতুড়ে কাণ্ডর হীরো বলে সন্দ করছে না। দোকান-পসারে ঢুকছি, খাবার-দাবার খাচ্ছি—"

"তা তো খাচ্ছি।" মদনা মনমরা হয়ে বলে, "কিন্তু গজু উকিল সত্যি মানুষ কিনা, সে সন্দ তো ঘুচছে না।"

ট্যাপা বলে, "কেন বল তো?"

"কেন বুঝছিস না? হরঘড়ি ওকে দেখতে পাচ্ছিস কিনা? এই দেখছি এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে মাদুরে পড়ে ঘুমোচ্ছে, তক্ষুনি বেরিয়ে দেখি ওই সাহা-বাড়ির দোর-ধারে দাঁড়িয়ে আছে।...এই দেখছি এস্টেশনের দিকে চলে গেল, সেই দেখি ওদের পুকুর-পাড়ে ঘটি নিয়ে আঁচাচ্ছে।...দেখি আর গায়ে কাঁটা দেয়।"

ট্যাপা অন্যমনাভাবে বলে, "আমারও সে সন্দ হয় না তা নয়, ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ আমাদের সঙ্গে যখন খায়-দায়, কথা কয়, মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।"

"সেই তো!" মদনা বলে, "এই চিন্তায় মনের মধ্যে সুখ নেই রে।...নইলে ভুতুড়ে লীলা চালিয়ে গাঁ সুদ্ধু লোককে নাচ নাচিয়ে

বড় আমোদেই থাকার কথা।"

ট্যাপা একটু ভেবে বলে, "আমার মনে নিচ্ছে বোধহয় লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়ি গিয়ে খাচ্ছে-দাচ্ছে।···গিন্নী বোধহয় মায়ায় পড়ে খাওয়াচ্ছে, যত্ন করছে। ভূতই হোক, পেরেতই হোক, হাজব্যাণ্ড বলে কথা। নচেৎ অদিশ্যি হয়ে নিজেই নিয়ে-টিয়ে খায়!"

"তা দুই-ই হতে পারে।" বলে মদন একটা নিশ্বাস ফেলে, "কতদিন বাড়িছাড়া, ঠাক্‌মাটার জন্যে মন কেমন করছে।"

ট্যাপা বলে, "গুপি মোক্তার তো রহস্য ভেদ করে খবর দেবে বলেছে। নইলে—তার আগে গিয়ে পড়লেই যদি ফেরারি আসামী বলে ধরে!"

"সেই তো! সেদিন পালিয়ে এসে ভুল করেছিলাম। না পালালে তো আর—"

ট্যাঁপা মদনের কথা শেষ না হতেই বলে ওঠে, "পাড়ায় থাকলে, আমাদেরই আগে ধরত মদনা, এই বিধিলিপি করে রেখেছি আমরা।···দাগী আসামী তো? যেখানে যখন দাগ পড়বে, আমাদের ওপরই সন্দেহ এসে পড়বে।"

মদনা বলে, "এই পিতিজ্ঞে করছি, আর মন্দ কাজে না। ক্রেমশ লোকে দাগটা ভুলে যাবে। শুধু এখন চিন্তা, উকিলবাবু যে পাঁচশো করে টাকা দেবে বলেছে সেটা পাওয়া যাবে কিনা। মানে টাকা ওনার আছে কিনা, আর আসলে লোকটা মানুষই কিনা। টাকা পেলে সৎপথে কিছু করতাম!"

চা বানানো হয়ে গিয়েছিল।

এই পোড়ো বাড়িটায় সর্বত্রই এটা-সেটা ফালতু জিনিস ছড়ানো ছিল, যা ট্যাঁপাদের বেশ কাজে লেগে গেছে। যেমন তুলো-

ছেঁড়া বালিশ, কাঠি-ভাঙা মাদুর, শতজীর্ণ শতরঞ্চি, পায়া-ভাঙা চৌকি, চটা-ওঠা এনামেলের বাসন, খালি শিশি-বোতল-টিন ইত্যাদি। এখন তেমনি পড়ে-পাওয়া দুটো কলাইকরা-গেলাসে চা খেতে খেতে টঁ্যাপা আবার বলে, "আচ্ছা আজই এর একটা হেস্তনেস্ত হবে। উকিলবাবু তো 'মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি' বলে উই কোন দিকে যেন চলে গেল···চোখে দেখলাম। এরপর যদি আবার এই গাঁয়ের মধ্যে দেখি তাহলেই বুঝব—"

বেচারা নন্দী-ভৃঙ্গী খটকা নিয়ে বসে থাকে, ওদিকে গজপতি খটখটিয়ে হেঁটে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে পেঁছিয়।

৮

গজপতির মেয়ে গন্ধেশ্বরীর শ্বশুরবাড়ি বোড়ো গ্রাম থেকে বেশি দূর না হলেও, আরও ছোট্ট গোবিন্দপুর-মার্কা গ্রাম। সেখানকার ত্রিসীমানায় রিকশা তো দূরের কথা, একটা গরুর গাড়িও পাওয়া দুষ্কর। বেচারী গন্ধেশ্বরী সেই কবে বাবা খুন হওয়ার খবর পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছিল, সেই অবধি আর আসতে পায়নি···তবে কু খবর বাতাসে রটে, তাই গন্ধেশ্বরীর কানে এসে ঠিক পৌঁছচ্ছে, বাবা নাকি একদিন 'ভূত' হয়ে এসে বাড়ি ঢুকতে যাচ্ছিল, পঞ্চু খাঁড়া অনেক কষ্টে ভাগিয়েছে। কিন্তু পাড়া থেকে ভাগাতে পারেনি, গ্রামে ভৌতিক লীলা চলছে জোর কদমে। ···এমন কী, পঞ্চুকে পর্যন্ত ভূতে হাওয়া করে দিয়েছে।

গন্ধেশ্বরীর প্রাণটা আঁকুপাঁকু করলেও বটুক তাকে ওদিকে যেতে দিচ্ছে না।

আজ গন্ধেশ্বরী দাওয়ায় বসে সলতে পাকাতে-পাকাতে দুঃখু করে বলছিল, "বাবাই না হয় গেছে, কাকাও তো একবার 'মেয়েটা কেমন আছে' বলে আসতে পারে। আমার যে প্রাণের মধ্যে কী হচ্ছে!"

হঠাৎ সেই সময় তার বর বটুক বলে ওঠে, "ওই দেখো নাম করতে করতে তোমার কাকা আসছে। অনেক দিন বাঁচবে খুড়ো।"

যদিও বাপের থেকে তিন মিনিটের ছোট, তবু গণপতিকে গন্ধেশ্বরী 'কাকাই' বলে। আর কীই বা বলবে?

কাকা আসছে শুনে গন্ধেশ্বরী দাওয়া থেকে নেমে ছুটে উঠোন পার হয়ে বেড়ার দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ায়। 'কাকা' বলে পেন্নাম করতেও ভুলে যায়।

বটুক নিজেই তাড়াতাড়ি প্রণাম করে সে-ভুল শুধরে নিয়ে বলে ওঠে, "এই দ্যাখো মান-অভিমান। এখুনি বলা হচ্ছিল, কাকাও তো একবার আসতে পারে! সেই কাকা এসে হাজির, অথচ পায়ের ধুলোটাও নিচ্ছ না?"

গন্ধেশ্বরী তবুও 'কাকা' বলে ছুটে না-গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। গজপতি এগিয়ে আসেন। মৃদু হেসে বলেন, "কী রে গন্ধু, তোরও কি আমায় 'কাকা' বলে ভ্রম হচ্ছে?"

আর কোথায় আছে! বলার সঙ্গে-সঙ্গেই গন্ধেশ্বরী তার গায়ের উপর আছড়ে পড়ে ডুকরে বলে ওঠে, "বাবা! বাবাগো! তুমি বেঁচে আছ? উঃ, লোকে কত না মন্দ কথা রটিয়েছে। এখনও রটাচ্ছে!"

গজপতি মেয়ের মাথায় আদরের মৃদু চাপড় মারতে-মারতে বলেন, "কী রটাচ্ছে? বাবা খুন হয়েছে, বাবা ভূত হয়েছে, বাবা ভূতের দৌরাত্ম্য করে গ্রামের লোককে প্রলয় নাচন নাচাচ্ছে, এই সব তো?"

গন্ধেশ্বরী ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলে, "বলছে বাবা, এই সব বলছে। এই তোমার জামাইও বলছে।"

গজপতি মুচকি হেসে বলেন, "কী হে বাবাজীবন, এখনও সে সন্দেহ মনে পোষণ করছ না কি ? ভূত বলে মনে হচ্ছে ?"

বটুক দুই হাতে নিজের দুই কান নিজে মলে বলে, "এখনও আপনাকে যে ভূত ভাববে সে নিজে ভূত। তার চোদ্দপুরুষ ভূত।"

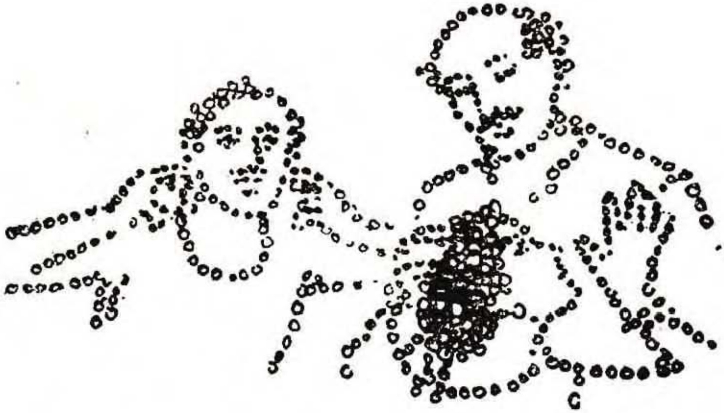

"বেশ বেশ !" গজপতি প্রসন্ন গলায় বলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা, যে আমায় চিনতে পারবে সেই আমার সত্যি আপন। তাই আমার বিষয় সম্পত্তি সব আমার এই মেয়েকে উইল করে লিখে দিয়ে দেব। তোমাকেও কিছু দেব, তুমি আমায় ভূত-টুত ভাবনি, শুধু খুড়শ্বশুর ভেবেছ। তা সেটা এমন কিছু ধর্তব্য নয়। কিন্তু আমার ওই গুণধর পুত্তুর ভবা, আমার প্রাণের যমজ ভাই গনা, আমার চিরকালের গিন্নী, তাদের আমি একটি পয়সা দেব না। ভেবে দেখ গন্ধু, কত দুঃখু ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছি, হারানো মানুষ ফিরে এল বলে কোথায় আহ্লাদে ভাসবি, তা নয়, রোজা ডেকে জল-বিছুটির ব্যবস্থা ! আমিও ওদের তেমনি ব্যবস্থা করেছি।"

ইশ! গন্ধেশ্বরী বাবার গায়ে হাত বুলিলে বুলিয়ে বলে, "আহা! মরে যাই!"

গজপতি বলেন, "এই তো, তুই তো দুঃখুটা বুঝলি। যা বলেছি, ঠিক। আমার সব টাকা তোকেই দেব।"

গন্ধেশ্বরী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "তোমার টাকায় আমার দরকার নেই বাবা, তুমি যে বেঁচে আছ, এই আহ্লাদেই নাচতে ইচ্ছে করছে আমার।"

বটুক আরও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আহা হা, বাবা আদর করে দিতে চাইছেন, দরকার নেই বলতে আছে? ছিঃ। তবে ইয়ে, শ্বশুরমশাই, আপনি তো শুনেছি ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না, বাড়িতেই রেখে দিতেন, তা সে-সব তো গুণ্ডারা লুঠ করে নিয়ে গেছে।"

গজপতি গোঁফে তা দিয়ে বলেন, "লুঠ অমনি করে নিয়ে গেলেই হল? এ কি ছেলের হাতে মোয়া? নাকি রামের মন্দিরে ভূতের নাচ? গজপতি রইল, আর টাকাগুলো উপে গেল? ও চিন্তা কোরো না, টাকাদের যদি নিজেদের না পাখা গজিয়ে থাকে তো যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। থাক্ ওসব কথা, যা দিকি গন্ধু, একটু জম্পেস করে চা বানাগে দিকি। আর তার সঙ্গে তোদের ঘরে ভাজা মুড়ি। বহুদিন তোয়াজ করে চা-মুড়ি খাওয়া হয়নি।"

গন্ধেশ্বরী তিন লাফে চলে যায় চা তৈরি করতে। আর মনে মনে ভাবে, আহা, বাবা বেচারী কী সরল! যারা খুন করতে এসেছিল, তারা যে কী করে গেছে, এখনো জানে না বোধহয়। কী আর করবে—চিরকালই তো কথা আছে—কৃপণস্য ধনং হরে বহ্নি পৃথ্বী তস্করে। তা এ সেই তস্করেই গেল। এর থেকে বাবা যদি অনেক খরচা করে খেত-পরত কত ভাল হত।

জম্পেস করে চা খেতে-খেতে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অনেক হাসি-গল্প করে গজপতি বলে, "চল গন্ধু, তোকে নিয়ে যাই। আসবার সময় একখানা খড়ের গাড়ির সঙ্গে ভাড়া ঠিক করে এসেছি। বটুক, তুমিও চলো হে। মেয়ে-জামাই নিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলে, দেখি কে ভূত বলে ভাগায়!"

বাবার গল্পে নন্দী-ভৃঙ্গীর রহস্য-ভেদ হয়ে গেছে, কাজেই এখন আর ভাবনা নেই, গন্ধেশ্বরী আহ্লাদে নাচতে নাচতে বাবার সঙ্গে গরুর গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

৯

মরি বাঁচি করে এক নিশ্বাসে ছুটে ছুটে বর্ধমান ইস্টিশান পর্যন্ত এসে বিনাটিকিটের যাত্রী হয়ে একেবারে কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে ট্যাঁপা আর মদনা নিশ্বাসটা ফেলে।

তারপর মদনা বলে, "দেখলি ? বলেছিলাম কিনা ?"

ট্যাঁপা বলে, "তাই দেখলাম। উঃ কী দিশ্য।...একই মানুষ, এদিকে ছুটো ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আহ্লাদে ভাসতে-ভাসতে পথ দিয়ে আসছে, আবার সেই মানুষই রাস্তার ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সেই দিক পানে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।"

তার মানে 'মানুষ' নয়।

"আচ্ছা ট্যাঁপা, আমরা কী বল দিকি ?"

"বুদ্ধু ভুতুম! এ ছাড়া আর কী ?"

কিন্তু ওরা কি আর বুঝতে পারছিল যে, মান্যগণ্য গুপি মোক্তারকেও তার গেন্নুপিসি উঠতে বসতে 'বুদ্ধুভুতুম' বলছেন।

না-বলবেনই বা কেন ?

যে মানুষ আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে, দু' মাস পরে বাড়ি ফিরেই চেঁচিয়ে পিসিকে জিজ্ঞেস করতে পারে, "পিসি, তোমার মাথায় ও কার গামছা ?" তাকে ও ছাড়া আর কী বলা যায় ? অন্তত গেনুপিসির অভিধানে ওর থেকে উপযুক্ত বিশেষণ আর নেই। গুপি বাড়ি-ছাড়া হয়ে অবধি পিসি আর দুপুরবেলা বাড়িতে টিকতে পারেন না, মন হুহু করে, তাই ভাতক'টা খেয়েই, 'মলা, দোর দে' বলে পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে যান। পিসির দিবানিদ্রা গেছে, রোদে পুড়ে পুড়ে বড়ি আচার আমসত্ত্ব বানানো গেছে, ডাঁটিভাঙা চশমাটা চোখে লাগিয়ে মহাভারত পড়া গেছে, সারা দুপুর শুধু এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়ানো সার হয়েছে।

মলয়কুসুমেরও তাসের আড্ডা ঘুচেছে। গেনুপিসি হুকুম দিয়েছেন, "খবরদার বেরোবি না, বেরোলে নোড়া মেরে পা খোঁড়া করে দেব। বাবু যদি হঠাৎ বাড়ি ফেরে, বাড়িতে তালা ঝোলানো দেখে ফিরে যাবে এই তুই চাস ?"

এছাড়া তিনি মলয়কুসুমকে এ কথাও শুনিয়েছেন যে, তার ওই তাসের আড্ডাটিই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। সেদিন যদি মলয় আড্ডায় না যেত, তাহলে কি তার গুপি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারত ? মলয়কুসুমও সেটা অনুধাবন করে মরমে মরে গিয়ে ঝরাকুসুম হয়ে গেছে। সত্যিই তো মলয় থাকলে বাবুর সাধ্য ছিল আনন্দনাড়ু ফেলে রেখে একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ?

অনুতাপে কাতর মলয় তাই এখন দুপুরে বসে-বসে হারমোনিয়ম শেখে। কমলা ভবনের অন্য-অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বলে, আহা ! এই শেখাটি যদি মলয় দু' মাস আগে শিখত, তাহলে গজপতি উকিল খুন হত না। গুণ্ডারা ভয়ে কেটে পড়ত।

সে যাই হোক্—সেই দিন তুপুরে গেন্নুপিসি খাওয়া সেরে বেরোতে যাচ্ছেন, দরজাটা খুলতেই গায়ের ওপর এসে পড়ল এক ঝলক রোদ!

গেন্নুপিসি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজ মনে বলে উঠলেন, "উঃ কী তাত! এই তো পরশু পর্যন্ত শীত ছিল, আর ফাগুন পড়েছে কি ফাগুনে আগুন ছুটিয়ে দিচ্ছে। মলা, এই মলা, একখানা গামছা ভিজিয়ে পাট করে নিয়ে আয় দিকি।"

মলয় তৎক্ষণাৎ হুকুম পালন করে হাজির।

গেন্নুপিসি চোখ কুঁচকে বললেন, "এখানা আবার কোথায় পেলি?"

মলয় বলল, "কেন ঠাকুমা, আপনার ঘরের দেয়ালে পেরেকে। এটা নেবেন না?"

"এনেছিস থাক।"

বলে গেন্নুপিসি সেই পাটকরা ভিজে গামছাখানি মাথায় দিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন, আর অমনি সামনে মূর্তিমান গুপি মোক্তার। এ হেন অভাবিত আশ্চর্য ঘটনায় চমকে উঠে গেন্নুপিসি চেঁচিয়ে ওঠেন, "কে? গুপি?"

কিন্তু গুপি সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরও অবাক করে দিয়ে প্রশ্নই করে বসেন, "গামছাখানা কার পিসি?"

এতেও যদি গেন্নুপিসি ভাইপোকে বুদ্ধুভুতুম না বলেন তো কিসে বলবেন? রেগে রেগে জিজ্ঞেস করবেন না—গুপির গামছাখানা তিনি

খেয়ে ফেলছেন কি না? একবার একটু ভিজিয়ে পাট করে মাথায় চাপা দিলে গামছাটা ক্ষয়ে যায় কি না? আর এতদিন পরে ফিরে এসে তুচ্ছ একটা গামছার কথা তোলা বুদ্ধুভুতুমের মত কাজ হয়েছে কি না?

কিন্তু গুপি মোক্তারের এতে কিছু এসে যায় না, গেন্নুপিসির কাছে বকুনি খাওয়া তাঁর চিরকালের অভ্যাস। শুধু কষ্ট দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা অনেক কিছু হল এই ভেবে, গামছাখানা যদি সেদিন পিসি তারের থেকে তুলে নিজের ঘরের দেওয়ালের পেরেকে না রাখতে যেত!

গেন্নুপিসি কড়া মেজাজে বললেন, "রেখেছিলাম, মন্দ করেছিলাম? বাতাসে উড়ে গেলেই বুঝি ভাল হত?"

আর কী বলবার আছে?

ভাল হত কি মন্দ হত, সেকথা বসে-বসে গেন্নুপিসিকে বোঝায় কে? উনি তো আবার ততক্ষণে ফিরে বাড়ি ঢুকে গুপের জন্যে লুচি ভাজতে বসেছেন। এখন নাকি গুপি মোক্তারের বেশ কিছুদিন ঘি-দুধ খাওয়া দরকার।

গুপির অবশ্য এতে আপত্তি নেই, এখন তো তাঁর মাথায় গন্ধমাদন পর্বত! গজপতি হত্যার রহস্য ভেদ তো এখনো বাকি। তদ্বির-তদারক করতে হবে, থানা-পুলিস করতে হবে, এবং ওই তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের 'দ্বারোদ্‌ঘাটন' কাজটি করতে হবে সমারোহ সহকারে।

গেন্নুপিসিকে কিছু বলে ফেলবার সাহস নেই; তাহলে সেই 'গোপনীয়' কথাটি তক্ষুনি সারা কলকাতার লোক জেনে ফেলবে। কথার সঙ্গী শুধু মলয়কুসুম। মলয়কুসুমের কাছেই জানা গেল, ইনস্‌পেক্টর কেবু ঘোষ গেন্নুপিসিকে জেরা করতে এসেছিল; পিসি পুলিস ডাকবার ভয় দেখিয়ে তাকে ভাগিয়েছেন। এমন কী, পুলিসে

না কুলোলে জজ ডাকতেও হুকুম দিয়েছেন মলয়কুসুমকে।

গুপিকে এখন ছুটতে হচ্ছে কেবু ঘোষের কাছে। ছুটতে হচ্ছে যারা গজপতি উকিলের 'মৃতদেহ' নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল তাদের কাছে, আরও কত-কত সকলের কাছে। নইবার খাবার সময় নেই গুপির।

এমনি ছুটোছুটি করতে-করতে হঠাৎ একদিন ট্যাপা আর মদনার সঙ্গে দেখা।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম চিবোচ্ছিল, গুপি থমকে বলেন, "কী হে, তোমরা এখানে? কবে চলে এলে?"

দুজনে একসঙ্গে বলে, "নশুর্ণ।"

"নশুর্ণ! সেটা আবার কী?"

"কেন কাল পশুর্ণ জানেন না? তেমনি নশুর্ণ, খশুর্ণ, হশুর্ণ, ধশুর্ণ, টশুর্ণ, বশুর্ণ—"

"হয়েছে হয়েছে, বুঝেছি। তা চলে এলে যে? বেশ তো একখানা চাকরি পেয়েছিলে! যত ইচ্ছে ভূতের নেত্য করবার এমন একটা মারকাটারি চান্স কার ভাগ্যে জোটে?"

মদনা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, "কাজ নেই আমাদের অমন চাকরিতে। ভূতের আণ্ডারে কাজ করার বাসনা নেই আর।"

গুপি মোক্তার বলেন, "অ্যাই ছ্যাখো, এখনো সেই পুরনো কথা কেন? শুনেছ তো ব্যাপার?"

শুনলে কী হবে ?

ট্যাঁপা মাথা নেড়ে বলে, "শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। নিজের চক্ষে যা দেখলাম, তার ওপর কথা আছে!

"কী আবার দেখলি ?"

মদনা ট্যাঁপা দু'জনেই বলে ওঠে, "কী দেখলাম ? দেখলাম একই লোক একসঙ্গে এখানে, ওখানে, সেখানে।...গরুর গাড়ি চড়ে মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আসছে, আবার পথে দাঁড়িয়ে সে-ই আসাটা দেখছে। এর পরেও আবার থাকতে বলেন মোক্তারবাবু ?"

গুপি মোক্তার হোহো করে হেসে উঠে বলেন, "উঃ, সে রহস্য বুঝি ভেদ হয়নি এখনো তোদের কাছে ? যাক, হবে হবে, এই সামনের সোমবারেই সব রহস্যের ভেদ হবে। সোমবার বেলা দুটোয় একটি জমজমাট আসর বসবে গজপতি উকিলের সেই তেরো নম্বর ঘরে।"

ট্যাঁপা আর মদনা চেঁচিয়ে বলে, "সর্বনাশ! আমরা সেখানে যাচ্ছি না।"

গুপি মোক্তার আশ্বাস দেন, "আরে, আমি তো আছি। দেখবি সবাই থাকবে।"

এই সোমবারের খবর বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রামেও গেছে। মানে পাঠানো হয়েছে খবর। সেখানে এখন সাজ-সাজ রব।

জগদ্দলবাসিনী বলে রেখেছে, সাতজন্মে কলকাতা দেখেনি সে, এবারে গিয়ে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার, সিনেমা সব দেখে তবে ছাড়বে। আর গন্ধেশ্বরী বলেছে, আর কিছু না হোক, কলকাতায় যে সার্কাস হচ্ছে সেটা না দেখে ছাড়বে না, এবং কলকাতার দোকানের শাড়ি কিনবে গাদা গাদা। বাবা তো

বলেছে, আর কিপটেমি করবে না, আর তাকেই উইল করে সব টাকা দিয়ে দেবে।

গণপতির অবশ্য শখ-সাধ কিছু নেই, শুধু কলকাতায় এসে একটা চশমা করাবে। চশমার দরকার। খুব দুখ্‌খু করে বলেছে, নির্ঘাত চোখ খারাপ। না হলে দাদাকে সে চিনতে পারে না!

তা যে যে-ইচ্ছে নিয়েই আসুক, আসছে সকলেই।

১০

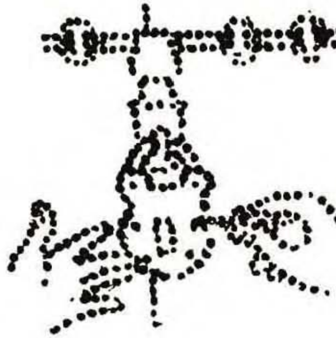

অবশেষে সেই সোমবার আসে।

কমলা ভবনের তেরো নম্বরের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা হয়। চাবি ছিল পুলিসের কাছে, কেবু ঘোষ এসে সে চাবি খোলেন। তাঁর সঙ্গে আরো পুলিস।

ফ্ল্যাট-বাড়ির অন্য বাসিন্দারা হাঁ করে দেখে, মৃত গজপতি উকিলের এক জোড়া প্রেতাত্মা গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।

এসেছে বাড়িওলা, এসেছে কেয়ার টেকার, এসেছে হাসপাতালের লোক, তাছাড়া উঁকিঝুঁকি মারতে-মারতে ট্যাঁপা-মদনাও ঢুকে পড়েছে।

এদিকে গেন্নুপিসি বসেছেন জাঁকিয়ে, তাঁর পিছনে জগদ্দলবাসিনী, গণপতির বৌ, আর গন্ধেশ্বরী।

এটা হচ্ছে শোবার ঘরের সামনের টানা লম্বা বারান্দা, অনেক লোক ধরে গেছে।

সবাই বসে, শুধু গজপতি উকিল দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা

পেন্সিল। এটা গজপতির মুদ্রাদোষ, কোর্টেও তিনি একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে সেইটাকে উঁচিয়ে উঁচিয়ে ভিন্ন কথা বলতে পারেন না।

এখন তিনি সেই কোর্টের ভঙ্গিতেই পেন্সিল উঁচিয়ে উঁচিয়ে বলে চলেন, "সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন, গত বিশে ডিসেম্বর, আমি, উকিল শ্রীগজপতি সাহা এই ফ্ল্যাটে আমার শোবার ঘরের মধ্যে 'নিহত' হই। জানেন কি না?"

কেবু ঘোষ বলে ওঠেন, "নিহত আর হয়েছেন কই? বরং যুগলরূপ ধারণ করে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

গজপতি পেন্সিল জোরে উঁচিয়ে বলেন, "সে-কথা পরের কথা। সেদিন আমি নিহত হয়েছিলাম, এবং আপনারা দরজা ভেঙে আমার মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে চালান দিয়েছিলেন, এটা সত্যি কি না? আর সেখান থেকে—আমায় মর্গে চালান করা হয়েছিল কি না? বলুন? জবাব দিন।"

কেবু ঘোষ এবং তাঁর সহকারী আমতা আমতা করে জবাব দেন, "তা হয়েছিল বটে।"

"তারপর আপনারা আমার এই পরম বন্ধু গুপি মোক্তারের বাড়ি হানা দিয়ে এঁর পিসিমাকে জেরা করে করে উত্ত্যক্ত করেছিলেন।"

একথা শুনে কেবু ঘোষ রেগে গিয়ে জোর গলায় বলেন, "উত্ত্যক্তের কীই বা করা হয়েছিল মশাই? আরো কত করবার ছিল। পাশের

ঘরে একটা খুন হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ইনি ফেরার হলেন, এতে তো জেরায় জেরবার করবার কথা, কিন্তু এই ডেঞ্জারাস মহিলাটি আমাদের উপযুক্ত তদন্ত করবার সুযোগই দেননি।"

গেনুপিসি নড়েচড়ে বসেন, তারপর চড়া গলায় বলে ওঠেন, "দেবে বৈ কি সুযোগ! গোকুল-পিঠে খাওয়াবে তোমায়! বাছা আমার মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেল, আর তুমি বাছা কিনা এলে ওকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার তালে।"

গজপতি সমবেতদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কেবু ঘোষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন, "তা বটে, তদন্ত করা আপনাদের কাজ। কিন্তু মর্গ থেকে একটা মড়া হাওয়া হয়ে গেল, তার তদন্তের কী হল? তাছাড়া আসলে সেটা মড়া কি জ্যান্ত, সে তদন্ত করেছিলেন?"

কেবু ঘোষ রেগে বলেন, "সব কাজ আমাদের নয়। আপনাকে গলায় গামছা দিয়ে মেরে রেখে টাকাপত্তর লুঠ করে নিয়ে গেছে, সেটাই দেখেছি আমরা। তারপর যদি আমাদের জব্দ করতে আপনি আবার বেঁচে ওঠেন সেটা আমাদের দোষ নয়।"

গজপতি মৃদু হেসে আবার পেন্সিল তুলে বলেন, "তা অবশ্য নয়। তবে কে মেরে গেল, কী ভাবে গেল, সে-হিসেব রেখেছেন?"

কেবু ঘোষ বলেন, "তদবধি তো সে-তদন্ত চলছেই।"

"কিছু আবিষ্কার করেছেন?"

"এত তাড়াতাড়ি কি হয় মশাই?" কেবু ঘোষ বলেন, "একটি কেসের ফয়সালা করতে কত ঝামেলা, আপনিই কি জানেন না?"

গজপতি আবার একটু মৃদুমন্দ হাসি হেসে বলেন, "তা জানি। তবে এটাও জানি, মশা মাছি পিঁপড়ে অথবা অশরীরী আত্মা

ছাড়া, সকলেরই, অন্তত মানুষ মাত্রেরই, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে একটা দরজা-ফরজার দরকার হয়। কিন্তু আপনারা সেটা জানেন না।"

সকলেই নড়েচড়ে বসে।

এ-কথার মানে?

কেবু ঘোষ বলেও ওঠেন, "তার মানে?"

"মানে বোঝাচ্ছি। বাড়িওলা মশাই, আপনার বাড়ি, আপনি সবই জানেন, আমার যে-শোবার-ঘরটা তাতে একটা ভিন্ন দুটো দরজা নেই, তা জানেন নিশ্চয়?"

"তা আবার জানি না?" বাড়িওলা বলে, "এ-বাড়ির প্রতিটি ইঁট-কাঠের হিসেব আমার মুখস্থ।"

"সে তো থাকবেই।" গজপতি পেন্সিলটি নাচিয়ে নাচিয়ে বলেন, "যাক্, দরজা ওই একটাই। আচ্ছা, হত্যাকাণ্ডের দিন ঘরের কোনো জানলা-টানলা ভাঙা পড়ে থাকতে দেখেছেন?"

বাড়িওলা জোরে-জোরে বলে, "ভাঙবার মত জানলা আমার বাড়িতে পাবেন না মশাই। সব লোহার খিল ছিটকিনি। গরাদগুলো দেখবেন।"

"দেখেছি।" গজপতি বলেন, "মৃতদেহ বার করতে অবশ্য দরজা ভাঙতে হয়েছিল, তা সেটা যে খুবই কষ্টসাধ্য হয়েছিল সেটা আমি টের না পেলেও আর সবাই পেয়েছিলেন নিশ্চয়?"

বাড়িওলা নিশ্বাস ফেলে বলে, "তা আবার পাইনি? দরজা ভাঙছিল না যেন আমার বুক ভাঙছিল।"

গজপতি একটু থেমে বলেন, "তা তো হতেই পারে। সে যাক, এখন আপনারা সকলে বিবেচনা করুন—জানলা ভাঙা ছিল না,

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, হত্যাকারী তাহলে বেরুলো কোথা দিয়ে ?"

অ্যাঁ !

যতগুলো লোক বসে ছিল, সবাই চমকে ওঠে। তাই তো! এটা তো এতদিন কারুর মাথায় আসেনি !

কেবু ঘোষের মাথার খাড়া চুল নেতিয়ে ঝুলে পড়ে।

গজপতি বলেন, "ইনস্পেকটর সাহেব, দরজা ভাঙবার সময় এটা আপনার খেয়াল হয়নি, হত্যাকারী মশা বা মাছি নয়।"

এখন কেবু ঘোষের মুখটাও ঝুলে পড়ে। আর গেন্টুপিসি দরাজ গলায় বলে ওঠেন, "আমিও তো তাই বলি, খুনেরা বেরুল কোথা দিয়ে ?"

ট্যাঁপা আর মদনা আর না বলে উঠে থাকতে পারে না, "তাহলে স্যার আপনিই বলুন কোথা দিয়ে গেল ?"

গজপতি একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলেন, "কোনোখান দিয়েই যায়নি। ঘরের মধ্যেই ছিল।"

বললেই হল ?

কেবু ঘোষ বলেন, "দরজা খোলবার সময় পাহারা ছিল না আমার ? কেউ পালায়নি।"

"পালাবে কেন ? পালাবার অবকাশই বা দিলেন কোথায় আপনারা ? তাকে তো বেঁধে-ছেদে মর্গে চালান দিলেন ?"

তার মানে ? তার মানে ?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "তার মানে আত্মহত্যা ?"

আত্মহত্যা !

গজপতি বলে ওঠেন, "কী দুঃখে ? কিছুই না। শুধু গলাটা খুশখুশ করছিল বলে, শুকনো গামছাখানা একটু গলায় জড়িয়ে

রেখেছিলাম! তারপর—"

"গামছা জড়িয়েছিলে?" গুপি মোক্তার রেগে উঠে বলেন, "গামছা জড়িয়েছিলে মানে? গামছা গলায় জড়াবার জিনিস?"

গজপতি গম্ভীরভাবে বলেন, "তাতে কী? যদি গামছাতেই কাজ হয়, অকারণ পয়সা খরচ করে মাফলার কম্ফর্টার এসব কেন কিনতে যাব আমি? সর্দি কাসি হলে আমি গামছাই গলায় জড়াই। সেদিনও জড়িয়েছি। হঠাৎ গামছার মধ্যে পিঁপড়ে সুড়সুড় করে ওঠায় টানাটানি করতে গিয়ে গেল ফাঁস পড়ে।"

অ্যাঁ!

"হ্যাঁ! গেল। আরও টানাটানি করতে গিয়ে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়িয়ে, ঘর-সংসার তচনচ করে শেষ অবধি মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। ব্যস্, এই ঘোষ মশাই তার খবর পেয়ে আমায় মড়ার গাড়িতে তুলে চালান দিলেন।"

ট্যাঁপা গলা বাড়িয়ে বলে, "কিন্তু এখনো তো সামনে ধাঁধার সমুদ্দুর। শেষ অবধি প্রানটা রক্ষে করল কে?"

গজপতি অমায়িক গলায় বলেন, "রক্ষে করল কে? সেও ওই গামছা।"

"তার মানে? যেই ভক্ষক সেই রক্ষক? কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটল স্যার?"

"ঘটনা আর কী! গামছা আমি সহজে ফেলি না, যতক্ষণ না

শেষাবস্থায় পৌঁছয়, কাজ চালিয়ে যাই। এটাও ছিল ওই শেষাবস্থায়। তাই যেমনি দম বন্ধ হয়ে গলা ফুলে গিয়ে ফাঁস পড়তে শুরু করেছে তেমনি গামছাখানা ফাঁসতে শুরু করেছে।···ফাঁসতে ফাঁসতে কোনো এক সময় গলার ফাঁস আলগা। কাজেই—"

কথা শেষ না-হতেই গেন্নুপিসি ধিক্কার দিয়ে ওঠেন, "গুপে শুনলি? আর তুই? গামছা পুরনো না হতেই নতুন গামছা। তার মানে —মরার পথ পরিষ্কার করা।"

মদনা বলে ওঠে, "তবুও তো ধাঁধার দিঘি-পুকুর। সেই যখন আবার দেহধারণ করলেনই, তখন এই ছায়ামূর্তিটিকে সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? ওকে দেখেই তো আমাদের গায়ের কাঁটা ঘুচছে না।"

ছায়ামূর্তি! বলতেই গণপতির দিকে চোখ পড়ে গজপতির। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে শুরু করেন, হা হা, হা হা।

সেই জোরালো হাসি। হাসির দাপটে ভিড় করে মজা দেখতে আসা লোকেরা অনেকে ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যায়।

এ আবার কেমন হাসি। ভৌতিক ভৌতিক!

আসলে খুন-হয়ে-যাওয়া গজপতির এতদিনের বন্ধ ঘরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সময় হঠাৎ একজোড়া জলজ্যান্ত গজপতির আবির্ভাব হবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। গুপি মোক্তার কারুর কাছেই রহস্যভেদ করেননি।

সবাই হকচকিয়ে গেছে।

হাসি থামলে গজপতি বলেন, "ওরে ব্যাটারা, যমজ দেখিসনি কখনো? যমজ ভাই?"

যমজ! ঈ-ঈ-শ!

তার মানে বোড়ো গ্রামে সাহাবাড়ির দোতলার জানলায় গজপতির মুখের ওই কার্বন কপিটি দেখেছিল টঁ্যাপারা।

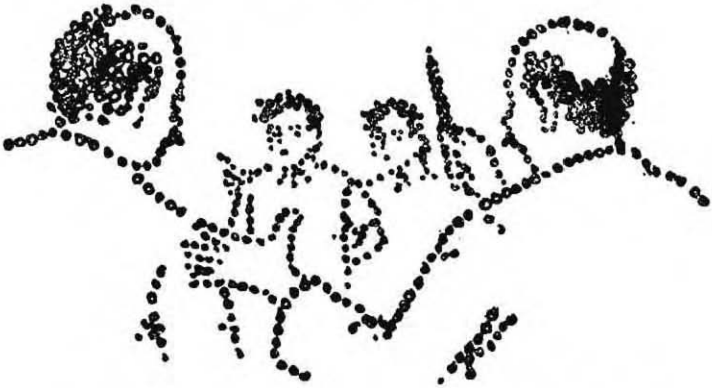

মদনা নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, "সাধে কি আর আমরা নিজেদেরকে বুদ্ধুভুতুম বলি ?"

"এবার থেকে 'গজকচ্ছপ' বলব।"

"হুতুমথুমোও বলতে পারি !"

তবু—

তবু টঁ্যাপা বলে ওঠে, "কিন্তু স্যার, দুটো ধাঁধার তো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, কিন্তু তিন নম্বরের ধাঁধাটা ?"

গজপতি পেন্সিল উঁচিয়ে বলেন, "সেটা আবার কী ?"

"সেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নিজে যদি ভুলক্রমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ফেলেছিলেন তো টাকাগুলো কোথায় গেল ? চোরডাকাত না এলে, বাক্স-প্যাঁটরা আলমারি-দেরাজ ফর্সা করল কে ?"

আলমারি-দেরাজ, বাক্স-প্যাঁটরা !

গজপতি আকাশ থেকে পড়েন, "বাক্স-প্যাঁটরা আলমারি-দেরাজে

টাকা রাখতে যাব আমি? আমি কি পাগল, না মাথাগোল? ওসব কি একটা টাকা রাখবার জায়গা হল?"

"তা তুমি তো ভাই ব্যাঙ্কেও টাকা রাখো না। তবে?"

গজপতি যেন হতাশ হয়ে যাচ্ছেন এদের বোকামিতে। "ব্যাঙ্কেই বা রাখতে যাব কেন? টাকা হচ্ছে মা লক্ষ্মী, একবার ঘরে এলে কি আবার ঘরের বার করতে আছে? টাকা যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। গদির মধ্যে।"

গদির মধ্যে?

"না তো কী? গদিটা দিন দিন পুরু হচ্ছে কেন তবে? টাকা খানিক জমলেই গদির ধারের সেলাই কেটে কেটে ঢুকিয়ে ফেলি।"

শুনে কেবু ঘোষের নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে করে। ঈশ! সেদিন যদি মৃতদেহটাকে ঘটা করে গদিতে চাপিয়ে নিয়ে যেতাম! রাগে চেঁচিয়ে উঠে বলেন কেবু ঘোষ, "বিশ্বভুবনে এমন কথা কখনো শুনিনি মশাই!"

গজপতি অমায়িক হেসে বলেন, "বেশ, তাহলে একটা নতুন কথা শোনাতে পারলাম আপনাদের। যাক আপনারা তাহলে এবার আসুন গিয়ে। গুপি, সেদিন তুমি যখন পিসির ডাকে উঠে গেলে, ছকটায় কোন ঘুঁটিটা কোথায় ছিল তোমার মনে আছে? স্মরণে এনে সাজিয়ে ফেলো দিকি। সে-দানটা শেষ হয়ে যাক।"

এরপরও কি ট্যাঁপারা আর চুপ করে বসে থাকতে পারে? ডুকরে উঠে বলে, "আপনি তো স্যার টাকার গদিতে শুতেন, তা-ই শোবেন, ঘুঁটি খেলতেন, তা ই খেলবেন, আমাদের কী হল? জন্মে জীবনে একটা মহৎ কর্ম করতে গিয়েছিলাম, একটা খুনী আসামী ধরিয়ে দিচ্ছিলাম, বেঁচে উঠে সেটি গুবলেট করে দিলেন। তার ওপর আবার

ভূতের নেত্য করিয়ে হাড়ে-হাড়ে ব্যথা ধরিয়ে দিলেন, এখন বলছেন, সবাই এসো গিয়ে !"

গজপতি ওদের দিকে তাকিয়ে পেন্সিল ফেলে দু'হাত তুলে বলেন, "আরে নন্দী-ভৃঙ্গী! তোরা কোথায় যাবি? তোরা কেন যাবি? তোরা খাবি দাবি থাকবি। ওই গদিটা বড্ড বেশী পুরু হয়ে গেছে, পিঠে ফোটে, ভাবছি খানিক হালকা করে ফেলব। তোদের দিয়েই বউনি হোক। কিন্তু খবরদার, আর কক্ষনো লোকের পকেটে কাঁচি চালাতে যাবি না।"

নন্দী-ভৃঙ্গী মুখে কথাটি কয় না।

শুধু চারখানা হাত নিঃশব্দে চারটে কানে উঠে যায়।

জন্ম ঃ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

সে-কালের রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম, তাই স্কুল-কলেজে যাননি, যা-কিছু পড়াশোনা বাড়িতে। খুব অল্পবয়স থেকেই লিখছেন। সাহিত্যজীবনের শুরু ছোটদের রচনা দিয়ে। মাত্রই তেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'শিশুসাথী' পত্রিকায়। পরবর্তী রচনা একটি গল্প, সেটিও ছাপা হয় 'শিশুসাথী' পত্রিকাতেই। কবিতাটির নাম—'বাইরের ডাক', প্রথম গল্পটির নাম—'পাশাপাশি'। শুধুই ছোটদের জন্য লিখেছেন ১৩২৯ সাল থেকে একটানা চোদ্দ বছর।

বড়দের জন্য লেখা প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ সালে, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রথম উপন্যাস, ১৩৫১ সালে কমলা পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত।

শতাধিক গ্রন্থের লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন, পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। দুটি পুরস্কারই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য। ট্রিলজির প্রথম গ্রন্থ এটি। অন্য দুটি গ্রন্থ—'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'।

প্রচ্ছদ ঃ মদন সরকার